# পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

## ২ ডিসেম্বর ২০০৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

# পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

## ২ ডিসেম্বর ২০০৩

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

# পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি ২০০৩

## পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর
## পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন

## পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়সমূহ

### ক) সাধারণ

- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান
- ❑ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিনীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

### খ) জেলা পরিষদ

- ❑ অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ
- ❑ সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান
- ❑ ভোটার তালিকা প্রণয়ন
- ❑ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত
- ❑ উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত
- ❑ পার্বত্য জেলা জেলা পুলিশ
- ❑ ভূমি সংক্রান্ত এখতিয়ার
- ❑ পরিষদের বিশেষ অধিকার
- ❑ পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

### গ) আঞ্চলিক পরিষদ

- ❑ পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- ❑ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- ❑ সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান
- ❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন
- ❑ উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার
- ❑ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
- ❑ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি
- ❑ অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

### ঘ) পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমা

- ❑ উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন
- ❑ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
- ❑ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত
- ❑ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি
- ❑ রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ
- ❑ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান
- ❑ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা
- ❑ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদান
- ❑ সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার
- ❑ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন
- ❑ সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার
- ❑ সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ
- ❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

# বিষয়সূচী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়সমূহের বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন রয়েছে এ অংশে।

**পৃষ্ঠা ▸ ১ - ৩৮**

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় দেশের বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, উন্নয়ন কর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ সভায় চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্য এ অংশে বিধৃত হয়েছে।

**পৃষ্ঠা ▸ ৩৯ - ৯৪**

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে। এই অংশে চুক্তিটি পত্রস্থ করা হলো।

**পৃষ্ঠা ▸ ৯৫-১১১**

প্রচ্ছদের ছবি: ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধ উপলক্ষ্যে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০১ রাঙামাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত গণসমাবেশের একাংশ।

# সম্পাদকীয়

২ ডিসেম্বর ২০০৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৬ষ্ঠ বছর। দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ও অনেক আশা আকাংখার শুভ সূচনা ঘটেছিল এই চুক্তির মধ্য দিয়ে। শান্তির শ্বেত কপোত সুনীল স্বচ্ছ আকাশে অনাবিল শান্তির পাখনা মেলেছিল সেদিন আর দীর্ঘদিনের জটিল সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের দ্বার হয়েছিল উন্মোচিত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, দীর্ঘ ৬টি বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা এখনো হতাশাব্যঞ্জক। চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো - যেগুলোর উপর নির্ভর করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান - সেগুলো এখনো রয়ে গেছে বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্ত থেকে অনেক দূরে।

বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের ষড়যন্ত্র ও অসদিচ্ছার কারণে শেখ হাসিনা সরকার ৩ বছর ৮ মাসের সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। পরিণামে মানুষের মনে নেমে এসেছে হতাশা আর সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভের। বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই অবস্থান নিয়েছে চুক্তিকে নানাভাবে পদদলিত করার নীতি। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে জুম্মদের মধ্য হতে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ না করে একজন বহিরাগত সেটেলারকে নিয়োগ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জুম্মদের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করা পার্বত্যবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। অপরদিকে সেনাশাসন ও অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথ কার্যকরকরণ, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন রয়ে গেছে সুদূর পরাহত। পক্ষান্তরে অব্যাহতভাবে চলছে সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল, ব্যাপক অনুপ্রবেশ, সামরিক দমন-পীড়ন ইত্যাদি কার্যক্রম। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি হয়ে পড়েছে অত্যন্ত নাজুক আর সংকটাপন্ন।

এমনিতর অবস্থায় গত ১৪-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে ২ ডিসেম্বর ২০০৩ তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ পালন করা; ৩০ নভেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অপাসরণ করা না হলে তিন জেলাব্যাপী ৮ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করাসহ বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করা; ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা ও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩ এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা ও উক্ত সময়ের মধ্যে নিয়োগ করা না হলে বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহণ করার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

যুগে যুগে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে, জীবন বলি দিয়েছে, ধ্বংসের স্তুপ থেকে গড়েছে নতুন সমাজ। বিগত সময়ে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঘোষিত গণতান্ত্রিক কর্মসূচী সফল করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী সকল স্থায়ী বাসিন্দা এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন এবং সুশীল সমাজসহ দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

## চুক্তির প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

চুক্তির উক্ত প্রস্তাবনা অংশে বর্ণিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা' কথাগুলির মধ্যে বিশেষতঃ 'সকল নাগরিকের' কথা দ্বারা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের যারা নাগরিক বা বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। চুক্তিতে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বীকৃতি, স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা নির্ধারণ, স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত যোগ্যতা-অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়াবলীর সাপেক্ষেই তা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে যে, উক্ত সকল নাগরিক বলতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বা অবস্থানরত স্থানীয় ও অস্থানীয় সকল ব্যক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে।

অপরদিকে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চুক্তি ১৯৯৭ সালে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা জারী করা হলেও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট তা প্রেরণ করা হয়নি এবং চুক্তি সম্পর্কে এবং চুক্তির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা অদ্যাবধি প্রেরণ করা হয়নি- এই অজুহাত দেখিয়ে সরকারী প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ চুক্তিকে উপেক্ষা করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে বার বার দাবী উত্থাপন করা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হতে এখনো পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও বিভাগ হতে চুক্তি বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ বা সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরঞ্চ যতদুর সম্ভব চুক্তি ও চুক্তির ধারাসমূহ সম্পর্কে অপব্যাখ্যা পূর্বক তা লঙ্ঘন করে কর্ম সম্পাদনের সর্বাত্মক প্রবণতা ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে উক্ত 'সকল নাগরিকের' কথাগুলি দ্বারা সরকারী পরিকল্পনাধীনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

বসতিদানকারী বাঙালী সেটেলার এবং পাবত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত প্রবেশকৃত বা প্রবেশরত অন্যান্য বাঙালী সেটেলারদেরকেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে চুক্তিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে বলে অপব্যাখ্যা দিয়ে আগেকার মতো তাদের অনুকুলেই সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জটিলতা অব্যাহত রয়েছে।

# ক -খন্ড
# সাধারণ

## পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান

এই খন্ডের ১ নং ধারার বলা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ (সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

চুক্তির এই ধারায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়ন অর্জনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ সরকার পক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়নি। এ লক্ষ্যে গত ২০/৪/২০০২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সমস্যাবলী সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত বৈঠকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর হাতে ৩০ দফা সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। কিন্তু দীর্ঘ ১৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও এই স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য কোন ইতিবাচক প্রতিফলন এ যাবৎ দেখা যায়নি। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল বিগত ২০০১ সালের ডিসেম্বর ও ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তি, জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ রোধ, চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, বেকার সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে ৩২ দফা সম্বলিত বিষয়াবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিবসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রী ও সচিবদের নিকট উত্থাপন করে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতেও কয়েকবার প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু সরকার পাকিস্তান আমল হতে অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অনুকুল নীতি গ্রহণ না করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে এখনো মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বরঞ্চ 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুন্ন করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমতল জেলাগুলো থেকে নিয়ে আসা সেটেলারদের পুনর্বাসন, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার জন্য সেটেলারদের মদদ দান, বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তকরণ, জেলা প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান, চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ভূমি বেদখল, বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান এবং নতুন করে সেটেলারদের

অনুপ্রবেশ ঘটানো ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও আবাসভূমির অস্তিত্ব চরম হুমকির মুখোমুখী হয়েছে।

উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতি তথা স্থায়ী বাসিন্দাদের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াই অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলীতে ৩৩ (তেত্রিশ)টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে ১৯৮৯ হতে ১৯৯২ ১০টি বিষয় বা বিভাগের কর্ম ও প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তির পর কোন বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কার্যাবলী ব্যতীত অন্যান্য কার্যাবলী সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা মন্ত্রণালয় সরাসরি তিন পার্বত্য জেলায় সম্পাদন করে চলেছে। উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বিশেষতঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন প্রকৌশল অধিদপ্তর বা বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সম্পাদন করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ৬ মে ১৯৯৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন জাতীয় সংসদে প্রণীত হয়েছে এবং ২৪ মে ১৯৯৮ এর সরকারী গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ চুক্তি ও আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনে বা আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রয়েছে এবং নানাভাবে চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধীতা করে চলেছে । মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে স্মারক নং মপবি/জেপ্রঃ-২/২(১২)/২০০০-৩১ তারিখ ১০ এপ্রিল ২০০১ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর যথাযথ অনুসরণ এবং পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনার্থে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গৃহীত/গৃহীতব্য সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদকে অবহিত রাখার জন্য এক সরকারী পরিপত্র জারী করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। এছাড়া সরকার পক্ষের সদিচ্ছার অভাবে পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধান প্রণীত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদনে নানা প্রতিকুলতায় মুখোমুখী হচ্ছে।

পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুযায়ী ভূমি বন্দোবস্ত ও হস্তান্তর সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছেন। এই বিষয়ে তারা ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ জুলাই ১৯৮৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন অস্বীকার করে চলেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালে প্রণীত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন অনুসরণ না করে এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক যে সকল ভূমি বন্দোবস্ত, ইজারা ও হস্তান্তর করা হয়েছে সে সকল বাতিল করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

## সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন-করণের বিধান

এই খন্ডের ২ নং ধারায় বিবৃত করা হয় যে, উভয়পক্ষ (সরকার ও জনসংহতি সমিতি) এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ভিত্তিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এবং বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ মে জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় এবং ২৪ মে ১৯৯৮ তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনে চুক্তির সংগে বিরোধাত্মক ৪টি ধারা এবং খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইনে একটি করে চুক্তির সঙ্গে বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। উক্ত বিরোধাত্মক ধারাসমূহ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশোধন করার জন্য জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বহুবার দাবী উত্থাপন করা হয়। অনেক বিলম্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের "স্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা" এর সংজ্ঞা সম্পর্কিত ধারাসহ অন্যান্য কতিপয় ধারা চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংশোধন করা হয়। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারার একটি অংশ অদ্যাবধি সংশোধন করা হয়নি। ফলতঃ চুক্তি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮ নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ৩৫ নং আইন) করা হয়। আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বিধৃত আছে যে, এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্যকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

চুক্তির এই ধারা অনুযায়ী চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠনের জন্য স্মারক নং-২৮৬/পাচজসস/২০০২ তারিখ ৩০/০৭/২০০২ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির পক্ষ থেকে বর্তমান জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পত্র লেখা হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বর্তমান জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বিষয়টি উত্থাপন

করেন। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কিছুটা উদ্যোগ গৃহীত হলেও সরকার কর্তৃক তা এখনো কার্যকর করা হয়নি। উক্ত কমিটি গঠিত না হওয়ার ফলে চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া এখন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৮ সালের ২১ মার্চ, ১৬ এপ্রিল, ৭ আগষ্ট ও ২ নভেম্বর এবং ২০০১ সালের ১ জুলাই তারিখে মোট ৫ (পাঁচ) বার কমিটির বৈঠক হয়। ১৩ জুলাই ২০০১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিগত সরকারের মেয়াদ শেষ হলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সদস্য (যিনি কমিটির আহবায়ক) ও অপর আরেকটি সদস্যপদ (পদাধিকার বলে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান) শুণ্য হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং (সম-১)-৬০/৯৮-২২৯ তারিখ ১৩-৯-২০০১ মূলে চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

এই খন্ডের ৪ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

চুক্তির এই ধারা অনুসারে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদনীয় সবকিছু বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু চুক্তির এই ধারা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ হতে এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথভাবে কোন আদেশ, নির্দেশ বা পরিপত্র প্রেরণ করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বার বার দাবীর প্রেক্ষিতে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে স্মারক নং মপবি/জেপ্রঃ-২/২(১২)/২০০০-৩১ তারিখ ১০ এপ্রিল ২০০১ মূলে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তাদের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার নিকট জানানো হলেও চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং নানা অজুহাতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে চুক্তি বা সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা অব্যাহত রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তি লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

সরকার ও আঞ্চলিক পরিষদ পরিষদ প্রতিনিধিদলের মধ্যে ২০০৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১২ মার্চ ও ২৩ এপ্রিল চার বার আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকগুলোতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বাধীনে আইন, সংসদ ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমদ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান এবং বিএনপি'র হুইপ ওয়াহিদুল আলম উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সদস্য গৌতম কুমার চাকমার নেতৃত্বে সুধাসিন্ধু খীসা ও কেএস মং মারমা সদস্যদ্বয়ও আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম তিনটি বেঠক সম্পর্কিত কার্যবিবরণীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে স্বাক্ষর করেন। অথচ পরবর্তীতে এই কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদ কমিটি নামে বলা হয়ে থাকে।

এ বৈঠকগুলোতে চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন- ২০০১' এর সংশোধনপূর্বক ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীন জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, তিন পার্বত্য

জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ হস্তান্তরকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রথম তিনটি বৈঠকের কার্যাববরণী ২৩ এপ্রিল ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকে পেশ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করা হয় -

(১) সরকার কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও একজন সদস্যের শুণ্য পদ পূরণকরণ;

(২) ভূমি কমিশনের জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তিকরণ;

(৩) হর্টিকালচার সেন্টার, প্রধান তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরকরণ;

(৪) তিন পার্বত্য জেলায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত স্তাপনকল্পে কার্যক্রম গ্রহণকরণ।

উক্ত চতুর্থ বৈঠকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" সংশোধন বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হলেও তা সমাপ্ত হতে পারেনি।

সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান পদে শ্রী সমীরণ দেওয়ানকে নিযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় জেলা জজ ও দায়রা জজ আদালত স্থাপনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে "দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন (সংশোধন) আইন ২০০৩" পাশ করা হয়েছে। ভূমি কমিশনের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ জনবল নিয়োগ ও অফিস স্থাপন করে ভূমি সমস্যা সমাধানে কোন অগ্রগতি সাধিত হতে পারে না।

# খ খন্ড

# পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ

এই খন্ডের ভূমিকায় বলা আছে যে, উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়ে পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছে।

## অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ

এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, **"অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা"** বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

১৯৯৮ সালের ৯, ১০ ও ১১ নং আইন দ্বারা চুক্তি মোতাবেক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন কালে 'বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি' এর মধ্যে অবস্থিত 'এবং' শব্দটির পরিবর্তে 'বা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ১৯৯৮ সালের ২৩ নং আইন দ্বারা চুক্তি মোতাবেক 'এবং' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এই ধারা ও আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে এর বাস্তবায়ন বা কার্যকরকরণ বিরোধিতা করছে। এছাড়া বৈধ জায়গা জমি না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ বহিরাগতদেরকে অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সনদপত্র প্রদান করে যাচ্ছেন এবং এর বদৌলতে বহিরাগতরা ভুমি বন্দোবস্তীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরী ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে। অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও স্থায়ী বাঙ্গালী বাসিন্দাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে আগেকার মতো যথাসাধ্য বঞ্চিত করা হচ্ছে।

## সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান

এই খন্ডের ৪ নং ধারার (৫) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তা জেলার সার্কেল চীফ স্থির করবে এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসেবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না। (৬) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসেবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারা ও আইন সম্পর্কে অপব্যাখ্যা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়নে বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই ধারা কেবলমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখনো জেলা

প্রশাসক কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ফলে অনেক বহিরাগত ব্যক্তি জেলা প্রশাসক থেকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকুরী ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং পাচবিম (প-১)-পাজেপ/সনদপত্র/৬২/৯৯-৫৮৭ তারিখ ২১/১২/২০০০ মূলে তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে নির্দেশ জারী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে আপত্তি জানানো হলে ১/৭/২০০১ অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটির সভায় উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলসহ দেশের অপরাপর অঞ্চলের জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই। ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" শিরোনামের পরিপত্রে জেলা প্রশাসকগণকে কেবলমাত্র নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

অপরদিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্মারক নং-রাপাজেপ/শিক্ষা-দুই-৩৬/৯৭(৪র্থ খন্ড)৪৭৩ তারিখ ১৯/০৯/২০০২ মূলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৭টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪৭টি সহকারী শিক্ষক এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্মারক নং-১৭-২৬(৩)২০০০/২০০২-৬২৪(১০০)/পাজেপ তারিখ ১৮/০৯/২০০২ মূলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪৩ টি সহকারী শিক্ষক পদে জারীকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সার্কেল চীফের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র চাওয়া হয়েছে। আইনের উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা প্রদানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন করে কেবলমাত্র সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র কার্যকর করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখ প্রদত্ত নির্দেশের মতো তিন পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে সম্প্রতি পুনরায় নির্দেশ জারী করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ অদ্যাবধি অপরাপর জেলার অউপজাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তাদের পক্ষে একদিকে স্থায়ী বাসিন্দা পরিচিহ্নিত করা কঠিন এবং অন্যদিকে অপরাপর জেলার অউপজাতীয় বাসিন্দাদের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে বা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করার নীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে কোন কোন জেলা প্রশাসক পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষতঃ চাকুরী, জমি বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দাগণ চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছেন এবং অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছেন। এক কথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে নিয়োগকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক পদে উক্ত দুই পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকের প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র মূলে অনেক অস্থায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দা চাকুরী প্রাপ্ত হয়েছেন। ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসেকর প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র

ব্যবহার করে পার্বত্য জেলার বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় তিনজন ছাত্র মনময়সিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসনেই ভর্তি হয়েছেন।

## ভোটার তালিকা প্রণয়ন

এই খন্ডের ৯ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন- যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁর বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকে; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

এই ধারা আইনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর প্রেক্ষিতে ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া সরকার প্রণয়ন করে এবং তা আইনানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে প্রেরিত হয়। এই খসড়ার উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা সুপারিশ সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তারপর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে উক্ত ভোটার তালিকা বিধিমালা যথাশীঘ্র প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর পর তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কখন প্রণীত হবে তা এখনো জানা যায়নি।

উল্লেখ্য যে, আইনের এই ধারা লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৫ মে হতে ২৪ জুন ২০০০ পর্যন্ত প্রণীত ভোটার তালিকায় বহিরাগত সেটেলারসহ অস্থায়ী বাসিন্দাদেরও অর্ন্তভূক্ত করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় ৪ লক্ষের মতো বাঙালী ভোটারের মধ্যে ৩ লক্ষাধিক ভোটার বসতিপ্রদানকারী সেটেলার ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত ব্যক্তি। বিগত সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারী পরিকল্পনাধীনে সমগ্র দেশের বিভিন্ন জেলা হতে হাজার হাজার বহিরাগত লোককে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং বেসরকারীভাবেও শত শত বহিরাগত লোক ভুমি বেদখল করে তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছে। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাবাহিনী, বিডিআর, ভিডিপি, এপিবি এর হাজার হাজার সদস্য নিয়োজিত রয়েছে। সর্বোপরি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত শত শত বহিরাগত লোক চাকুরী ও অর্থনৈতিক সূত্রে তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করছে। তাদের সকলকেই উক্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিগত সরকারের আমলে জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও অন্যান্যদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক জানানো হয় যে, উক্ত ভোটার তালিকা জাতীয় সংসদ এবং ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের জন্য চুক্তির উক্ত ধারা অনুযায়ী অউপজাতীয় বাসিন্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

এই প্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশনারের নিকট পুনরায় স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে নির্বাচন কশিশন থেকে জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান পরিবর্তন ব্যতীত অনুরূপ ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদল কর্তৃক দেশের সংবিধান, ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২-এর আলোকে ব্যাখ্যা ও যুক্তি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আইন মন্ত্রী কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নে আইনগত কোন বাধা থাকতে পারে না মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন। বর্তমান সরকারের

আমলে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদল একই বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান ও আইন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ এর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং বিশেষতঃ দেশের সংবিধান অনুসরণে উক্তরূপ ভোটার তালিকা বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তবে সরকার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ ও ১২২ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২ এর বিধান বলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ১৫ মে ২০০০ হতে সারাদেশ ব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এর প্রেক্ষাপটে এবং সর্বোপরি সংবিধানের ১১৯ ও ১২২ অনুচ্ছেদ এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ ও ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২ মোতাবেক সঠিক নয়। তাই জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারকে জানানো হয় যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ এর ভোটাধিকার/ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিধান শুধুমাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সীমিত না রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামোর প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের ২(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ এ বলা হয়েছে যে, 'কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত হইবার অধিকারী হইবেন যদি তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন' এবং ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে 'যিনি কোন ভোটার এলাকায় সচরাচর বা সাধারণতঃ বসবাস করেন তিনি সেই ভোটার এলাকার বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হইবেন'। তবে কোন নির্বাচনী এলাকায় বসবাসরত সকল স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাকে ঐ নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকায় ভোটার হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হতে হবে সে রকম কোন বিধান বা বাধ্যবাধকতা নেই। বরঞ্চ উক্ত অধ্যাদেশের ৮(২) ধারায় কেবলমাত্র আবেদন সাপেক্ষে ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে কার্যোপলক্ষে বসবাসরত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার তালিকাভূক্ত করার বিধান রয়েছে। সুতরাং কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনের ভোটার তালিকার অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়নে কোন বাধা থাকতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ও উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ শাসন কাঠামোর আলোকে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ইত্যাদি দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই ভোটাধিকার ও ভোটার তালিকা প্রণয়ন কার্যক্রম স্বতন্ত্র হওয়া অপরিহার্য। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সূত্রে বসবাসরত অস্থায়ী বহিরাগতরা তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভূক্ত হতে পারেন না।

জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনের জন্য একটা ভোটার তালিকা এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য অন্য একটা ভোটার তালিকা- এই দুই ধরণের ভোটার তালিকা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে তাহলে-

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে লংঘন করা হবে এবং উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।
২) উপজাতি ও স্থায়ী অ-উপজাতি বাসিন্দাদের ভোটাধিকার দ্বিখন্ডিত করা হবে এবং তাদের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হবে।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণ তাদের পছন্দমত ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার অধিকার হতে বঞ্চিত হবে।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন কাঠামো অস্বীকার করা হবে।

৫) জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভবপর হবে না।

৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে এই সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

৭) বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পরিগণিত হবে এবং সকল প্রকার নির্বাচনে প্রাধান্য বজায় রাখবে; যা চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সকল অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করবে।

৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণ দুই ধরণের ভোটার তালিকার অধিকারী হবেন যা সংবিধান পরিপন্থী।

২০০০ সালের মে-জুন মাসে প্রণীত চুক্তি ও সংবিধান পরিপন্থী ভোটার তালিকা দিয়ে বিগত ১ অক্টোবর ২০০১ অনুষ্ঠিত দেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে জনসংহতি সমিতি জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ডাক দিতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে একই কারণে ২০০৩ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন বর্জনের জন্য আহবান জানাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাধ্য হয়।

তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণ যাতে তাদের যথাযথভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গণপ্রতিনিধিত্বশীল শাসন সংক্রান্ত সংস্থাসমূহে নিজেদের উপযুক্ত প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচিত করার সুযোগ ভোগ করতে পারে তজ্জন্য অনতিবিলম্বে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা বিধিমালা সংশোধন একান্তই অপরিহার্য।

## কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত

এই খন্ডের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হয়নি।

এই খন্ডের ১৪ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা আছে যে, এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) নং উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। (গ) নং উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসন ও থানা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরঙ্কুশভাবে বহিরাগত। তারা নিজেদের আমলাতান্ত্রিক একাধিপত্য বজায় রাখার স্বার্থে ভূমিকা পালন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থা কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে চলেছে।

## উন্নয়ন প্রকল্প এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত

এই খন্ডের ১৯ নং ধারার বলা হয়েছে যে, পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্তণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৮ সালের ৯, ১০ ও ১১ নং আইন দ্বারা পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন কালে এই ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। উক্ত ধারা সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ঃ

> "(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।"
>
> "(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধনের জন্য বিগত সরকারের নিকট বার বার দাবী করা হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ নং আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রথমোক্ত (২ক) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত (৪) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়নি।

## পার্বত্য জেলা পুলিশ

এই খন্ডের ২৪ নং ধারার উল্লেখ আছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে।

এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়নি। পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অদ্যাবধি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

চুক্তি ও আইন মোতাবেক পার্বত্য জেলায় বা পার্বত্য জেলা হতে পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত ধরণের অগ্রাধিকার ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি। চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে 'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি হস্তান্তরের মাধ্যমে জেলা পুলিশ গঠনের জন্য সরকারের নিকট বার বার প্রস্তাব করা সত্ত্বেও সরকার বিষয়টি হস্তান্তর করেনি। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নকল্পে আশু পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশের সমতল জেলাগুলোতে কর্মরত উপজাতীয় পুলিশ কর্মকর্তা ও কনষ্টেবলদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলীর মাধ্যমে পার্বত্য জেলাসমূহের পুলিশ বাহিনী গঠনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়। সরকার কিছু সংখ্যক উপজাতীয় পুলিশ কনষ্টেবলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বদলী

করা ব্যতীত আজ অবধি কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সর্বোপরি পার্বত্য জেলা পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতা আইনগতভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে হস্তান্তর না করায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে জুম্মদের উৎখাত করে ভূমি বেদখলের প্রক্রিয়ার জোরদার হয়েছে।

## ভূমি সংক্রান্ত এখতিয়ার

এই খন্ডের ২৬ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

১৯৯৮ সনে এই ধারা রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উক্ত আইনের শর্তাংশে "সরকারের নামে" শব্দগুলির পরিবর্তে 'সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে' শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় পরিষদকে বুঝানো হয়ে থাকে। বার বার দাবীর মুখে অবশেষে ২০০০ সনের ২৯ নং আইন দ্বারা চুক্তি মোতাবেক যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়।

চুক্তি মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু আজ অবধি বিষয়টি জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে এই আইনকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে দোহাই দিয়ে জেলা প্রশাসকগণ ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান করে চলেছে। ২০০০ সালের জুন মাসে বান্দরবন সদর থানার সুয়ালক মৌজার ৭০৪ হতে ৭০৬ নং হোল্ডিং এবং তুমব্রু মৌজার ৬৩ থেকে ৬৭ নং হোল্ডিংয়ের প্রতি হোল্ডিংয়ে ২৫ থেকে ৫০ একর করে জমি জেলা প্রশাসক তার নিজের আত্মীয়, পুলিশ সুপার, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক ও রাজস্ব) ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পরিবার-পরিজনের নামে রাবার/হর্টিকালচার প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বেআইনী ভূমি দখলের তৎপরতায় জেলা ও থানা পর্যায়ের আরো ৪০ জন কর্মকর্তা জড়িত রয়েছেন।

এই বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৭ জুলাই ১৯৮৯ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অস্বীকার করে চলেছেন জেলা প্রশাসকগণ। এই অবৈধ ও বিধি বহির্ভূতভাবে প্রদত্ত উক্ত বন্দোবস্ত বা ইজারা বা হস্তান্তর বাতিলকরণের দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং পাচবিম (প-১)/পাঃজেঃ/বিবিধ/৮৫/২০০০/৫২৯ তারিখ ১৪/১০/২০০০ মূলে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সকল বন্দোবস্ত ও ইজারা বাতিল করা হয়নি।

এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও

বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।

এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন অনুসরণ করা হচ্ছে না। তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ এই আইন লঙ্ঘন করে ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করছেন। অন্যদিকে সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে দুই লক্ষ আঠারো হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবন জেলায় রয়েছে ৭২ হাজার একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশ পরম্পরায় জুম চাষ ও বসতি করে আসা জমিতে এখন পরবাসী হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর, বান্দরবন সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর, আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর, বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর এবং লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সেনাবাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। তন্মধ্যে ১১,৪৪৬ একর জমি আর্টিলারী প্রশিক্ষণের জন্য ইতিমধ্যেই জবর দখল করা হয়েছে। কেবলমাত্র বান্দরবন জেলায় বিভিন্ন নামে বন্দোবস্ত, ইজারা ও অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ নিম্নে এক নজরে দেয়া হলো--

| | একর |
|---|---|
| রুমা সেনানিবাসের গ্যারিসন | ৯,৫৬০ |
| বান্দরবান সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণ | ১৮৩ |
| আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন | ৩০,৪৪৬ |
| বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন | ২৬,০০০ |
| সংরক্ষিত বনায়ন | ৭২,০০০ |
| জেলা প্রশাসক কর্তৃক লীজ প্রদান | ১৮,৩৩৩ |
| মোট | ১৫৬,৫২২ |

এই ধারার (গ) উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পাশাপাশি (ঘ) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

এই উপ-ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় শত শত একর জলেভাসা জমি বহিরাগত সেটেলারদের বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু খাগড়াছড়ি জেলায় দীঘিনালা ও মহালছড়ি উপজেলার জলেভাসা জমি হতে একর প্রতি একসনা বন্দোবস্তী বা ইজারা বাবদ ৩০০ (তিনশত) টাকা এবং বাৎসরিক খাজনা ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে আইন বহির্ভূতভাবে আদায়ের অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপিত হলেও সেই বিষয়ে এখনো কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

অপরদিকে কর্ণফুলী হ্রদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং রুল কার্ভ যথাযথ অনুসরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে কর্ণফুলী হ্রদ পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠনের

জন্য বিগত সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে ১০/০৪/২০০০ তারিখ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, চুক্তি মোতাবেক প্রণীত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয় এবং তারই প্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বোচ্চ জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর করা হয়। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে কর্ণফুলী হ্রদ পরিষচালনা কমিটি পুনর্গঠন প্রয়োজন বলে উক্ত চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়। কিন্তু বিগত শেখ হাসিনা সরকার কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ২৫/০২/২০০১ পূর্বের মতো চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারকে সভাপতি এবং কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাবস্থাপককে সদস্য সচিব করে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি গঠন করা হয়।.....এর প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে আবারও চিঠি লেখা হয়। অবশেষে বর্তমান জোট সরকারের আমলে ২০/০৭/২০০২ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কাপ্তাই হ্রদের সাথে এই এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। হ্রদের বিস্তীর্ণ প্রান্তিক এলাকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা হ্রদ পরিচালনার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। হ্রদ সৃষ্টির সূচনালগ্নে তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অথচ হ্রদ পরিচালনা কমিটিতে তাদের কোন যথাযথ ও ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নেই। এমতাবস্থায় জনস্বার্থে আঞ্চলিক পরিষদের প্রস্তাবানুসারে পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে কর্ণফুলী হ্রদ পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা যুক্তিসঙ্গত। উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ প্রতিমন্ত্রী বিবেচনা করে দেখা যাবে বলে আশ্বাস দিলেও আজ অবধি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

এই খন্ডের ২৭ নং ধারায় আরো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রয়োগের ক্ষমতা জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়নি।

## পরিষদের বিশেষ অধিকার

এই খন্ডের ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে। অধিকন্তু ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে। ৩২ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন আনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ থেকে সরকার বিরত রয়েছে। এমনকি বিগত আগস্ট মাসে হঠাৎ করে সেনাবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রামে যানবাহন চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণারোপ ঘোষণা করে। তার পাশাপাশি দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে এবং বিরোধীদলকে ঠেকাতে সরকার যে দ্রুত নিষ্পত্তি আইন প্রণয়ন করেছে তা পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকর করছে। অথচ এই আইন প্রণয়নকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যথাক্রমে কোনরূপ পরামর্শ ও আলোচনা করা হয়নি।

## পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

এই খন্ডের ৩৩ নং ধারায় পরিষদের কার্যাবলী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় - জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন; পুলিশ (স্থানীয়); উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার; বৃত্তিমূলক শিক্ষা; মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা; মাধ্যমিক শিক্ষা; সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ। এই খন্ডের ৩৪ নং ধারায় পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত হয় - ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ) পুলিশ (স্থানীয়); গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ) যুব কল্যাণ; ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ) স্থানীয় পর্যটন; ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট) মহাজনী কারবার; ঠ) জুম চাষ।

উল্লেখিত বিষয়সহ পরিষদের আওতাধীন বিষয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩-এ। কিন্তু চুক্তির পর কোন বিষয়ই জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।

এই খন্ডের ৩৫ নং ধারায় আরো উল্লেখ করা হয় যে - ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি; খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর; গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ; জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ; ঞ) ব্যবসার উপর কর; ট) লটারীর উপর কর;ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর ইত্যাদি ক্ষেত্র ও উৎসাদি পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করার ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে দেওয়া হয়নি।

# গ খন্ড
# পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

## পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

এই খন্ডের ১ নং ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ২ নং ধারা অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন। ৩নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। ৫ নং ধারা অনুসারে তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং পরিষদের সভায় তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

এ খন্ডের ৯ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় উল্লেখ আছে যে, পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

উল্লেখিত এই ধারাসমূহে আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৮ সালে ৭১ জন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় সাধনের জন্য সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ তা অমান্য করে। আঞ্চলিক পরিষদ থেকে উক্ত নিয়োগ বাতিল করে নিয়োগ কমিটি পুনর্গঠন করে পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপিত হলে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব আঞ্চলিক পরিষদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। আঞ্চলিক পরিষদ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। কিন্তু রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে চলেছে। সম্প্রতি সেপ্টেম্বর ২০০২ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জারীকৃত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসকদেরকে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে আঞ্চলিক পরিষদের নির্দেশকে অমান্য করে চলেছে উল্লেখিত দুই পার্বত্য জেলা পরিষদ। এছাড়া বর্তমান জোট সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগদানের পর থেকে পরিষদসমূহ আঞ্চলিক পরিষদকে অবজ্ঞা করে চলেছে। বিশেষ করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নক্ষত্র লাল দেববর্মন একবারও আঞ্চলিক পরিষদের সভায় যোগদান করেননি। এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সরকারের একটি বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বিরোধীতা ও অসহযোগিতা করে যাচ্ছে।

এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের প্রণীত ও অনুমোদনকৃত বাজেট অনুযায়ী সরকার যথাযথভাবে বরাদ্ধ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে। পরিষদের কার্যবিধিমালাসহ অন্য কোন বিধি সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি প্রণয়ন করা হয়নি। বিধি প্রণীত না হওয়ার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ ইতিমধ্যেই পরিষদের কার্যবিধিমালা সম্পর্কে লিখিতভাবে সরকারের নিকট মতামত পেশ করেছে। কিন্তু সরকার এখনো তা ঝুলিয়ে রেখেছে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রণীত ও সরকারের নিকট পেশকৃত ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট সংশোধনের জন্য সরকারের তরফ থেকে আঞ্চলিক পরিষদকে বার বার চাপ করে চলেছে এবং বাজেট অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

## পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

৯ নং ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, আঞ্চলিক পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদুপরি আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে ২০০১ সালে পৌরসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহকে নির্দেশনা দেয়া হয়। তৎসত্ত্বেও পৌরসভাসমূহও দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে আঞ্চলিক পরিষদকে অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করে যাচ্ছে। ২০০০ সালে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম দেখা দিলে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হলে রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কানরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় পরিষদ বিধানাবলীতে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধনী অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

## সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান

৯ নং ধারার (গ) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিগত সরকারের আমলে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে স্মারক নং মপবি/জেপ্র-২(১২)/২০০০-৩১ তারিখ ১০ এপ্রিল ২০০১ মূলে আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে মর্মে পরিপত্র জারী করার পরও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

কোন কোন কর্তৃপক্ষ হতে চুক্তি বিরোধীতাকরণে মদদ থাকায় এবং কর্মকর্তাদের নিজেদের আমলতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার স্বার্থে উপরোক্ত আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন প্রাক্কালে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃংখলা বিষয়ক এক সভা আহবান করা হলে বান্দরবন জেলা প্রশাসক ও উক্ত পুলিশ সুপার সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন

৯ নং ধারার (ঘ) উপ-ধারায় উল্লেখ আছে যে, আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও

কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় দেশে বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুযায়ী গঠিত কমিটি ও কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারী বরাদ্দও অনুরূপভাবে প্রদান করা অব্যাহত রয়েছে। এসব ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে চরম অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দেখা দিয়েছে।

বিগত সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে তিন পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। পরে আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর মুখে পরিষদের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করলেও তদনুযায়ী সংশোধন না করেই এনজিও নীতিমালার প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। ফলে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক অনেক বিষয় উক্ত এনজিও নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কতগুলো বিষয় সন্নিবেশিত হয় যা জুম্ম জনগণের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত ও ক্ষতিকর। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই কতিপয় এনজিও এতদাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও চাহিদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন লোকদের নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, এনজিও কার্যক্রমে বহিরাগত লোকদের নিয়োগদান, স্থানীয় এনজিওদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা ইত্যাদি। কোন কোন এনজিও কর্তৃক এখানকার জুম্ম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী ও আচার-ব্যবহারের ফলে জুম্মদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

অপরদিকে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত কতিপয় এনজিওদের উপর বিশেষ নজরদারীর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় এনজিওদের উপর বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এছাড়া পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। এনজিও নীতিমালা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধন হচ্ছে না। পক্ষান্তরে চুক্তি ও আইন লংঘন করে বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকগণ এনজিও সমন্বয় বৈঠক আহবান করে চলেছে।

## উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার

৯ নং ধারার (ঙ) উপ-ধারায় বিধান করা হয় যে, উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী জুম্মদের আইন ও সামাজিক বিচারের উপর নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। ২০০০ সালে বান্দরবন জেলা প্রশাসক কর্তৃক মারমা জনগোষ্ঠীর সামাজিক সংক্রান্ত একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়। এতে মারমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার বরকলক আতিয়ার সেনা ক্যাম্পের সুবেদার আহম্মদ কর্তৃক স্থানীয় অধিবাসী কুমারী মধুরানী চাকমা পীং গদারাম চাকমাকে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা কিরন্যা চাকমা পীং কাল্যাজিরা চাকমার সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনন্যোপায় হয়ে এক পর্যায়ে মেয়েটির অভিভাবকরা রাঙ্গামাটিতে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু উক্ত সেনা কম্যান্ডার মেয়েটির অভিভাবকদের বাধ্য করে মামলাটি প্রত্যাহার করতে। অন্য কোন উপায় না দেখে মেয়েটি অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এরপর

সামাজিক ও জমি সংক্রান্ত বিচার তিনি ছাড়া কেউ করতে পারবে না। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে জমি দেয়া যাবে না।

## ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান

৯ নং ধারার (চ) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, আঞ্চলিক পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সরকার কর্তৃক অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সার কারখানা স্থাপন বিষয়ে সরকার বিদেশী কোম্পানীর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মত নেয়া হয়নি।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

এই খন্ডের ১০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। এই ধারার প্রথম অংশ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইন অনুসরণের জন্য মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হতে প্রজ্ঞাপনও জারী করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অনুসরণ করেনি।

বিগত সরকারের আমলে একজন উপজাতীয় ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হলেও বর্তমান সরকারের আমলে এই বিধান লঙ্ঘন করে একজন অউপজাতীয় ব্যক্তিকে (বহিরাগত সেটেলার আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে) নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। এতে করে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে। তা সত্ত্বেও সরকার উক্ত নিয়োগ বাতিল করেনি। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাবার পর আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও মানিকছড়ি এলাকাসহ সেটেলার অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নের সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করে চলেছে এবং ওয়াদুদ ভূঁইয়া নামে যত্রতত্র নতুন নতুন সেটেলার পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জুম্ম অধ্যুষিত এলাকায় কোন উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

২৬ আগষ্ট মহালছড়িতে জুম্ম বসতির উপর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত এমপি তথা সেটেলার নেতা আবুদল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপসারণের জোরালো দাবী উঠে। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র মহালছড়ি হামলায় আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার কারণে তাঁর অপসারণের দাবী আরও জোরালো হয়ে উঠেছে তা নয়; তার দীর্ঘ অপকর্ম এবং দুর্নীতিও এর পেছনে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত দেড় বছরে তাঁর সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতি ইত্যাদি প্রমাণ করেছে যে, তাঁকে অচিরেই চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন যেমনি চরমভাবে ব্যাহত হবে তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দিন দিন চরম আকার ধারণ করবে। নিম্নে বিগত দেড় বছরাধিক মেয়াদে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো -

**১। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম সাম্প্রদায়িকীকরণ**

(ক) ইউনিসেফ এর সাহায্যপুষ্ঠ সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত খাগড়াছড়ি জেলার ৮৮ টি পাড়া কেন্দ্র, রাঙামাটি জেলার ৬৩ টি পাড়া কেন্দ্র এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৮৪ টি পাড়া কেন্দ্র সেটেলার অধ্যুষিত এলাকায় স্থানান্তর।

(খ) রাঙামাটি জেলাধীন সাজেক ও বরকল এলাকা থেকে সেটেলার অধ্যুষিত রামগড় ও মানিকছড়িতে কমলা বাগানের প্রকল্প স্থানান্তর। অথচ রামগড় ও মানিকছড়ি এলাকা কমলা বাগানের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

(গ) উন্নয়ন বোর্ডের সকল ঠিকাদারী কাজ নানা কৌশলে কেবলমাত্র আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মী তথা সেটেলারদের প্রদান।

(ঘ) দলীয় নেতা-কর্মী তথা সেটেলারদের কোন প্রকল্প জমা পড়লে তা অবশ্যই অনুমোদনের জন্য উন্নয়ন বোর্ডের সকল কর্মকর্তা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের নির্দেশ প্রদান।

**২। ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি**

(ক) শাস্তিমূলক বদলীসহ নানা হুমকি দিয়ে খাগড়াছড়ির জেলার সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাখা এবং তাদের মাধ্যমে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া।

(খ) মুজিবুর রহমান হাওলাদার খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক থাকাকালে 'জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি ও জেলা ভূমি বরাদ্ধ কমিটি'র মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণের জন্য চেঙ্গী ব্রীজের সন্নিকটে জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে সিদ্ধান্ত বাতিল করে ইন্সটিটিউটের স্থান সেটেলার অধ্যুষিত শালবন নামক স্থানে স্থানান্তর। উক্ত ভূমির মালিক অমূল্য রঞ্জন চাকমা ও হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা জায়গাটি ছেড়ে দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন। এবং ইন্সটটিউটের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকরাও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৯৮ লক্ষ টাকা।

(গ) এরশাদ আমলে স্থাপিত খাগড়াছড়ি উপজাতীয় ছাত্রাবাস ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে তা এতিমখানায় পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(ঘ) নিয়মবহির্ভূতভাবে স্বীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতার বাইরে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ।

(ঙ) মানিকছড়ি উপজেলায় জুম্মদের ১৩০ একর ভূমি বেদখল করে উন্নয়ন বোর্ডের টাকায় সেটেলারদের পুনর্বাসন দিয়ে ওয়াদুদ পল্লী বানানো এবং একই উপজেলায় সেটেলার বাঙালীদের জন্য ভূমি বেদখল করে জিয়া সড়ক নাম দিয়ে রাস্তা নির্মাণ।

(চ) বিগত ইউপি নির্বাচনে বিশেষ করে দীঘিনালা উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদে তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার জন্য সন্ত্রাস, কারচুপি, বুথ দখল ইত্যাদি অপকর্মের আশ্রয় গ্রহণ। যেমন ১৯/২/০৩ দীঘিনালা পোমাং পাড়ায় অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর মনোনীত প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা না হলে পাহাড়ী-বাঙালী নির্বিশেষে কাউকে শান্তিতে থাকতে না দেয়া বা কোন উন্নয়ন প্রকল্প না দেয়ার হুমকি; ভোট চলাকালে ফুলচান কাবরী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালী সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়া; মেরুং ইউনিয়নের উত্তর

রেংকায্যা কেন্দ্র ও ভূঁইয়াছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জুম্মদের জোরপূর্বক লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে বুথ দখল করা ইত্যাদি অন্যতম।

(ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান থাকলেও আঞ্চলিক পরিষদকে অবজ্ঞা করা এবং কোন দলিল ও তথ্য আঞ্চলিক পরিষদকে সরবরাহ না করার জন্য বোর্ডের কর্মকর্তাদের নির্দেশ।

(জ) উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে গাড়ী ক্রয়ের জন্য সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে বরাদ্ধকৃত ২০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের জীপ ক্রয় করা। এছাড়া কোটি কোটি টাকার তছরুপসহ অন্যান্য দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

(ঝ) সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ও কোন প্রয়োজন ছাড়া ঢাকার অভিজাত এলাকা শুলশানে মাসিক ৪০ হাজার টাকা ভাড়ায় উন্নয়ন বোর্ডের লিয়াঁজো অফিস ও রেষ্ট হাউসের নামে একটি বিলাস বহুল বাড়ী ভাড়া নেয়া। অথচ রাঙামাটি হচ্ছে বোর্ডের সদর দফতর এবং বোর্ডের সব ধরণের কাজ পার্বত্যাঞ্চল কেন্দ্রীক।

**৩। অনুপ্রবেশ, ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি**

(ক) ওয়াদুদ ভূঁইয়া ও খাগড়াছড়ি রিজিয়ন কমান্ডারের প্রত্যক্ষ মদতে সেটেলাররা লেমুছড়ি মৌজার ১৯ জন জুম্ম অধিবাসীর ১১০ একর এবং চংড়াছড়ি মৌজার ৪৪ জন জুম্ম অধিবাসীর ১৮৩ একর ভূমি বেদখল করা।

(খ) ভূমি বেদখলের অংশ হিসেবে ২০০১ সালের ১৮ মে দীঘিনালা থানার মেরুং, ২৫ জুন রামগড় এবং অতি সম্প্রতি ২৬ আগষ্ট ২০০৩ মহালছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করা।

(গ) অনুপ্রবেশ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বগুড়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর ইত্যাদি জেলাসহ বিভিন্ন সমতল জেলাগুলোর সাথে খাগড়াছড়ির সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করা। এ সকল জেলাগুলো থেকে পরিবারের কর্মক্ষম লোকেরা প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে। এদিকে প্রত্যেক উপজেলা সদরে তাদের জন্য রিক্সা চালানো, রাস্তা-ঘাট মেরামত ও নির্মাণ কাজ, দিন মজুরী সহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানের নানা ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন কাজ করার পর কিছু অর্থ সঞ্চিত হলে এবং এলাকার সাথে পরিচিত হলে পরবর্তীতে সমতল জেলা থেকে স্ব স্ব পরিবার আনার ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ওয়াদুদ ভূঁইয়া গং-এর সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় পোটলা-পুটলিসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে উল্লেখিত বাস সার্ভিসের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক ও চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির কারণে ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।

## ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি

এই খন্ডের ১১ নং ধারার উল্লেখ রয়েছে যে, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অসংগতি দুরীকরণে সরকার কর্তৃক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

## অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ

এই খন্ডের ১২ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী অন্ত র্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আঞ্চলিক পরিষদের ৭ জন অউপজাতীয় সদস্যের পরিবর্তে বিএনপি দলের ব্যক্তিদেরকে উক্ত সদস্য পদসমূহে নিয়োগের দাবী উঠে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে অন্তবর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ কেবলমাত্র নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। সুতরাং উক্ত আইন লঙ্ঘন করে উক্তরূপ দাবী পূরণের কোন অবকাশ নেই। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিরষদ আইন বলবৎ রাখার স্বার্থে উক্তরূপ যে কোন পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে বাধ্য।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

এই খন্ডের ১৩ নং ধারায় বিধান করা হয় যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবে। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবে।

এই ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ী জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও নীতিমালা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিশন আইন ২০০১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রণয়ন বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।

# ঘ খন্ড
# পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

## উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১ নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক শরণার্থীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি এবং গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া গেল-

| | |
|---|---|
| **বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি** | **১৩৩৯ পরিবার** |
| বাগানভিটা ফেরৎ পায়নি | ৭৭৪ পরিবার |
| ধান্যজমি ফেরৎ পায়নি | ৯৪২ পরিবার |
| মোট জমি-জমা ফেরৎ পায়নি | ৩,০৫৫ পরিবার |
| হালের গরুর টাকা পায়নি | ৮৯০ পরিবার |
| স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি | ৬টি বিদ্যালয় |
| স্থানান্তারিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে | ৫টি বাজার |
| সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির | ৭টি মন্দির |
| সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম | ৪০টি |
| **ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা** | ৬৪২ জন |

এই খন্ডের ৭ নং ধারায় আরো বলা আছে যে, উপজাতীয় শরণার্থীদের মধ্যে যারা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে। কিন্তু এই ধারা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ৬৪২ জন প্রত্যাগত শরণার্থী ঋণ মওকুফের জন্য আবেদন করলেও সরকার অদ্যাবধি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিশেষ করে খাগড়াছড়ি এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার ষড়যন্ত্রে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। গত ২৯ আগষ্ট ২০০৩ দৈনিক ইত্তেফাক-এ "পাহাড়ী শরণার্থীদের রেশন বন্ধ" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, "...পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ী শরণার্থীদের রেশন প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায়। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক পত্রে জানানো হয় যে, পাহাড়ী শরণার্থীদের আর রেশন দেয়া সম্ভব নয়। বরঞ্চ এডিপি বরাদ্দ থেকে কোন উপায়ে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য কোন কিছু করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরো জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো এক নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে

বসবাসরত বাঙালী অভিবাসীদের রেশন অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, তাদের (অভিবাসী বাঙালীদের) যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য করণীয় প্রসঙ্গে কমিটি গঠন করার।"

জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করা নিঃসন্দেহে অমানবিক ও সাম্প্রদায়িক পদক্ষেপ বৈ কিছু নয়। অথচ তার আগে ১০ মে ২০০৩ স্মারক নং- পত্রসংখ্যা ২২.৫৯.১.০.০.৯৮-২০০৩-৩+৪ মোতাবেক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত এক পত্রে জানানো হয় যে - ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত থাকবে।

সরকারের উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর জুম্ম শরণার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া ও জমি-জমা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত শরণার্থীদের জন্য রেশন প্রদান অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন দাবীনামা জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলায় ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তিনদিন ব্যাপী সড়ক অবরোধ কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা হয়। তাদের এই সড়ক অবরোধের প্রতি সমর্থন প্রদান করে যথাক্রমে খাগড়াছড়ি জেলা জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠন। অবরোধের শেষ দিনে ২৮ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করার পর প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী ৭ অক্টোবর ২০০৩-এর মধ্যে পরিপূরণ করার আলটিমেডাম ঘোষণা করে। উক্ত ঘোষণা মোতাবেক ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ খাগড়াছড়িতে এক মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আরো একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল। পরে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান শরণার্থীদের রেশন প্রদান করা হবে মর্মে অবহিত করেন। এর সূত্র ধরে তিন মাসের রেশন প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে জানানো হয় যে, এই তিন মাসের রেশনকে ছয় মাসের রেশন হিসেবে ধরতে হবে। এ নিয়ে জুম্ম শরণার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

## আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১ নং ধারার শেষান্তে উল্লেখ আছে যে, তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নিদিষ্টকরণ করে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ধারা অনুসারে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। এই খন্ডের ১ নং ও ২ নং ধারায় স্পষ্টভাবে কেবল আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে থাকলেও সরকার পক্ষ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিকারী সেটেলারদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ফলে চুক্তি বাস্তবায়ন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বারবার আপত্তি সত্ত্বেও টাস্কফোর্স কর্তৃক সেটেলারদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিহ্নিত করে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের নবম সভা ত্যাগ করেন এবং সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল না করা পর্যন্ত টাস্কফোর্সের কোন সভায় যোগদান করবেন না বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এই মর্মে তারা যৌথভাবে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন। কিন্তু সরকার পক্ষ হতে কোনরূপ উত্তর প্রদান করা হয়নি। বরং টাস্কফোর্সের ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিহ্নিত করা হয়। ১৫ মে ২০০০ তারিখের একাদশ সভায় টাস্কফোর্স একতরফাভাবে পরিচিহ্নিত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা ও ঘোষিত প্যাকেজ সুবিধাদি নিম্নরূপ ঃ

| জেলা | উপজাতীয় পরিবার | অউপজাতীয় পরিবার | সর্বমোট পরিবার |
|---|---|---|---|
| রাঙ্গামাটি | ৩৫,৫৯৫ | ১৫,৫৯৫ | ৫১,১১১ |
| বান্দরবান | ৮,০৪৩ | ২৬৯ | ৮,৩১২ |
| খাগড়াছড়ি | ৪৬,৫৭০ | ২২,৩৭১ | ৬৮,৯৪১ |
| **সর্বমোট** | **৯০,২০৮** | **৩৮,১৫৬** | **১,২৮,৩১৪** |

প্যাকেজ সুবিধা ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের -

(ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে।

(খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকরা উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভুমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফসীল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে ২০০০ সালের জুন মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়কের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয় -

১. (ক) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম। উক্ত ধরনের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত

পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। পেশকৃত উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি হলো -

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;
(খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;
(গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;
(ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;
(ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;
(চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;
(জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;
(ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;
(ঞ) ঋণ মওকুফ করা;
(ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

১৩ জুলাই ২০০১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হলে এবং স্বাভাবিকভাবে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে তৎকালীন এমপি দীপংকর তালুকদার অপসারিত হলে তৎপরবর্তী সময় থেকে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠনের জন্য স্মারক নং ২৮৭/পাচজসস/২০০২ তারিখ ৩০/০৭/২০০২ মূলে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে সমীরণ দেওয়ানকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের বিষয়ে চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকার কর্তৃক যথাযথ নির্দেশনা দেয়া না হলে টাস্ক ফোর্স কর্তৃক কর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হতে পারে না।

## ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত

এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, সরকার ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করবে। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে বলে চুক্তির এই খন্ডের ৩নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই ধারা বাস্তবায়নে সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

অপরদিকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচায়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবে বলে এই খন্ডের ২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এই ধারা বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

## ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

এই খন্ডের ৪ নং ধারায় বলা আছে যে, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন এখনো গঠিত হয়নি। এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ তারিখে জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ এপ্রিল ২০০০ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ তারিখে কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারিরীক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তা রয়ে যায় ঝুলন্ত অবস্থায়। অপরদিকে ভূমি কমিশনের সচিব হিসেবে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হলেও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় অবাস্তবায়িত রয়ে যায়। অবশেষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবায়েদুল হককে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগদানের জন্য তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর ২০০১ কাজী এবায়েদুল হককে বাদ দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। আপত্তি থাকা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতি উক্ত নিয়োগাদেশকে গ্রহণ করে। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হলেও এখনো কমিশনের কাজ বা ভূমি নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক একদিন আগে ১২ জুলাই ২০০১ তড়িঘড়ি করে জাতীয় সংসদে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' পাশ করে। এই আইন পাশ করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত পরামর্শ ও সুপারিশমালা গ্রহণ না করেই। ফলে এই আইনে রয়ে যায় চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক বিষয় - যা চুক্তি ও জুম্ম জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। বিরোধাত্মক বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে -

১) আইনের ২(চ) ধারাতে 'পুনর্বাসিত শরণার্থী' অর্থ বলা হয়েছে যে, '৯ই মার্চ ১৯৯৭ তারিখে ভারতের আগরতলায় সরকারের সহিত উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় তালিকাভূক্ত শরণার্থী'। এই বিধান দ্বারা কেবলমাত্র ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ফিরে আসা শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে। ১৯৯২ সালে সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্পাদিত ১৬ দফা চুক্তির আওতায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধগুলো নিষ্পত্তির আওতায় পড়বে না।

২) চুক্তিতে প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। কিন্তু ভূমি কমিশন আইনের ৬নং ধারায় কমিশনের কার্যাবলীতে (১)(ক) উপ-ধারাতে কেবলমাত্র 'পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি বিরোধ' নিষ্পত্তির

বিধান করা হয়েছে। ফলে ২০ দফা চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত শরণার্থী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল ভূমি বিরোধ অনিষ্পত্তিই থেকে যাবে।

৩) চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত 'আইন, রীতি ও পদ্ধতি' অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও আইনের ৬(১)(খ) ধারায় কেবলমাত্র 'আইন ও রীতি' উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) চুক্তিতে 'ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)' বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের বিধান থাকলেও ভূমি কমিশন আইনে জলেভাসা জমির কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৫) কমিশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আইনের ৭(৫) ধারায় বলা হয়েছে যে, 'চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ধারা ৬(১) এ বর্ণিত বিষয়াদিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে'। এ বিধান বলে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের রাবার ষ্টাম্পে পরিণত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে চেয়ারম্যানকে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে।

৬) কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনের ১৩(১)(২) ধারাতে চুক্তির 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে' এই ধারা সংযোজন করা হয়নি।

উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর যে সকল ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক, সে সকল ধারা সংশোধনের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে ১৯ দফা সম্বলিত সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে গত ১২/৩/২০০২ আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ের আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ হতে পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও সদস্য রূপায়ণ দেওয়ান প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সভায় ১৮টি সুপারিশ বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়। কিন্তু অন্য একটি সুপারিশ অর্থাৎ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত "কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমি (ফ্রিঞ্জল্যান্ড)" এর ক্ষেত্রেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কর্তৃক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা সংক্রান্ত সুপারিশ সরকার পক্ষ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে এ সুপারিশ বিষয়ে মতামত জানানো হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ হতে ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে উক্ত সুপারিশমালার অনুকূলে মতামত প্রেরিত হয়। অতঃপর ২০০৩ সালের ২১ জানুয়ারী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ-এর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়। আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে ২৩ এপ্রিল ২০০৩ অনুষ্ঠিত বৈঠকে উক্ত ভূমি কমিশন আইন বিষয়ে আলোচনায় উত্থাপিত হয়। কিন্তু আলোচনা সমাপ্ত হতে পারেনি। ঐ কমিশন আইন সরকার এখনো যথাযথভাবে সংশোধন করেনি। ফলে ভূমি কমিশন কর্তৃক কাজ শুরু করা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে স্মারক নং পাচবিম(প-১)-বিবিধ/ভূমি/৯৮/২০০২-১৫৯ তারিখ ২০/০৮/২০০২ মূলে অনিষ্পন্ন ১০,০০০ (দশ হাজার) ভূমি বন্দোবস্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট এক নির্দেশনামা

প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ানের নিকট উত্থাপন করা হয় এবং নির্দেশনা বাতিলের অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত নির্দেশনামা স্থগিত করা হয়।

## রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ

এই খন্ডের ৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। কিন্তু এই ধারা আজ অবধি বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ অনুরূপ জমি বরাদ্দ কোন কোন জায়গায় অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবন জেলায় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলায় স্থানীয় সরকারী সংস্থা কর্তৃক মৎস্য চাষের নামে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় চিওনী পাড়ার ২০টি আদিবাসী মুরং পরিবার উচ্ছেদ হতে বাধ্য হচ্ছেন এবং এতে তাদের প্রায় ১৫ একর কৃষি জমি জলমগ্ন হবে। জানা যায়, কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন বোর্ডের তত্বাবধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে চিওনী পাড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঞংখ্যং ঝিরিতে মৎস্য চাষের নামে এই অবিবেচক বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে তা বন্ধ করার জন্য দাবী জানানো হয়। কিন্তু তারপরও এই বাঁধ নির্মাণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ফলে গত ৩০ জুলাই ২০০৩ ক্ষতির সম্মুখীন মুরং পরিবারের পক্ষ থেকে উক্ত চক্রান্তমূলক উদ্যোগ বন্ধের দাবী জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের বরাবরে একটি স্মারকলিপিও প্রেরণ করা হয়। স্মারকলিপিতে স্থানীয় কয়েকজন বাঙালী প্রতিনিধিও একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাক্ষর প্রদানে সামিল হন। কিন্তু এরপরও এপর্যন্ত এব্যাপারে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা না যাওয়ায় মুরংদের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ

এই খন্ডের ৯ নং ধারায় আছে যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্ত বায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবে। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবে।

কিন্তু সরকার কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা হয়নি। পর্যটন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কার্যকর কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি। এমনকি "স্থানীয় পর্যটন" বিষয়টি এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।

## কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

এই খন্ডের ১০ নং ধারায় বর্ণিত আছে যে, চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবে। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবে।

কিন্তু কোটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিশেষতঃ কোটা ব্যবস্থাধীনে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের জন্য চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি সেনা প্রশাসন জড়িত থাকায় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংরক্ষণে অসুবিধা সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় জিওসি-র পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেয়ার জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব সরকার পক্ষ হতে বিবেচনা বা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য কোন বৃত্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ঢাকা, ফেনী, চট্টগ্রাম ও কাপ্তাই পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে পাহাড়ী ছাত্রদের জন্য ৫% কোটা কমিয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৪টি আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর ২০০২ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক একটি কমিটি জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের কোটা বৃদ্ধি ও যথাযথ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। নিম্নে উক্ত শিক্ষা বিষয়ক কমিটির কোটা সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরা হলো–

(ক) নিম্নোক্ত প্রস্তাবানুসারে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা বৃদ্ধি করা–

| শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | কোটার বর্তমান সংখ্যা | প্রস্তাবিত কোটার আসন সংখ্যা |
|---|---|---|
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ২৫ টি | প্রতিটি বিভাগে ৩ টি |
| চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | প্রতিটি বিভাগে ২ টি | প্রতিটি বিভাগে ৪ টি |
| জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ১২ টি | প্রতিটি বিভাগে ৩ টি |
| অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় | -- | প্রতিটি বিভাগে ২ টি |
| বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) | ৪টি (বিভিন্ন বিভাগে ৩ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ১ টি | ১০ টি (বিভিন্ন বিভাগে ৮ টি ও স্থাপত্য বিভাগে ২ টি। |
| কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৩টি | প্রতিটি বিভাগে ৩ টি |
| মেডিকেল কলেজসমূহ | ৯টি (প্রতিটি জেলায় ৩ টি করে) | ১৮ টি (প্রতিটি জেলায় ৬ টি করে) |
| বিআইটি সমূহ | ২০ টি | ৩০ টি (জেলা প্রতি ১০ টি করে) |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ | -- | প্রতিটি বিভাগে ১ টি |
| কৃষি কলেজসমূহ | -- | ৬% |
| ইনষ্টিটিউট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং | ১ টি | ৫ টি |
| ইনষ্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি | ৫% | ৬% |
| পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটসমূহ | -- | ৬% |
| ক্যাডেট কলেজসমূহ | -- | ৬% |
| মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম | ১ টি | ৬% |

খ) উপজাতীয় কোটার মধ্যে অধিকতর পশ্চাদপদ জাতিসত্ত্বাসমূহের অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম নম্বরের অধিকারী হলে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সুযোগ প্রদান করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে উপজাতীয় কোটার নীতিমালা প্রণয়ন করা।

ঘ) মেডিক্যালসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় কোটার ভর্তির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/চট্টগ্রাম ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান ও পুলিশ ভেরিফিকেশনের নিয়ম বাতিল করা।

ঙ) বিআইটিসমূহে ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম নম্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা এবং উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের সকল বিভাগে ভর্তির সমান সুযোগ প্রদান করা।

চ) সাধারণ প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে কোটায় অন্তর্ভুক্ত না করে মেধা তালিকায় ভর্তি করা।

ছ) উপজাতীয় কোটায় অউপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি রোধকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র চালু করা।

জ) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অধিকতর পরিমাণে স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঝ) মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় কোটায় ভর্তিসহ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী বাছাই এর দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের হাতে হস্তান্তর করা।

কিন্তু উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

## উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা

এই খন্ডের ১১ নং ধারায় বলা আছে যে, উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবে। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করবে। কিন্তু উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পূর্বেকার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

## জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান

এই খন্ডের ১৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবে। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতি এই ধারা বাস্তবায়িত করেছে।

## সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করবে। ১৬ নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে,

জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে। এই ধারার (খ) উপ-ধারায় উল্লেখ আছে যে, জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

এই ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে এখনো ৫০০ মামলা অপ্রত্যাহৃত রয়ে গেছে। বিশেষত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া অত্যন্ত মন্তর। এছাড়া সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল–

| জেলা | মোট মামলার সংখ্যা | প্রত্যাহৃত মামলা | অপ্রত্যাহৃত মামলা |
|---|---|---|---|
| রাঙ্গামাটি | ৩৫০ | ২৮৫ | *৬৫ |
| খাগড়াছড়ি | ৪৫১ | ৪০৫ | ৪৬ |
| বান্দরবন | ৩৮ | ৩০ | ৮ |
| **মোট** | **৮৪৪** | **৭২০** | **১১৪** |

*সাজাপ্রাপ্ত ৪৩টি মামলাসহ

জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২১ জন বন্দী সদস্য মুক্তি পেয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত মামলাগুলোর সাজা মওকুফের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি সাজা মওকুফ করা হয়নি। এছাড়া চুক্তির আওতায় তিন পার্বত্য জেলায় গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত সরকারী কমিটি কর্তৃক প্রত্যাহার করা হলেও চট্টগ্রাম জজ কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে অজুহাতে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কাজে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের (চট্টগ্রাম জজ কোর্টে বিচারাধীন মামলার আসামীদের) বিভিন্ন থানায় ওয়ারেন্ট জারী করা হচ্ছে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

অপরদিকে এই ধারার (গ) উপ-ধারায় বলা আছে যে, অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেপ্তার করা যাবে না। কিন্তু সমিতির সদস্য ছিলেন বলে আইনগতভাবে ঘোষণা দিয়ে বন্দী করা না হলেও কার্যতঃ সমিতির সদস্য ছিলেন এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজনকে নানা অজুহাতে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী করা হয়েছে। ১৯৯৯ সনে রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী থানায় সাধন তঞ্চঙ্গ্যা নামে প্রত্যাগত একজন সদস্যকে বন্দী করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা থানা সেনাবাহিনী কর্তৃক সমিতির প্রত্যাগত সদস্য মংসাথোয়াই মারমাকে হত্যা ও অলিয়া চাকমা ওরফে সুপ্রীমকে বেধড়ক মারধর করে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় অনুভূতি চাকমা ও কালায়ন চাকমাকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়।

## জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১৪ নং ধারার (ঘ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে। (ঙ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

জনসংহতি সমিতির ৪ (চার) জন সদস্য সুনীল তালুকদার পীং সুধীর চন্দ্র তালুকদার, রত্ন বিকাশ চাকমা পীং পূর্ণ চন্দ্র চাকমা, জ্যোতির্ময় চাকমা পীং সিংহ মনি চাকমা ও হৃদয় রঞ্জন চাকমা পীং তুক্ক চন্দ্র চাকমার ঋণ মওকুফের আবেদন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পূর্বে চাকুরীরত ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে তারা চাকুরীতে পুনর্বহাল হলেও চরম হয়রানির শিকার হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্তদের অবসর ভাতা বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হতে সরকার বিরত রয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট ১১ জন সদস্যকে অদ্যাবধি স্ব স্ব চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়নি।

পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে স্মারক নং পাচবিম(সমে-১)-০২/২০০০-৮২ তারিখ ১৮/০৪/২০০১ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিকট 'পুনর্বহালকৃত উপজাতীয় কর্মচারী (ব্যতিক্রমী সুবিধাদি) বিধিমালা ২০০১' নামে একটি খসড়া বিধিমালা প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে মতামতও প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার খসড়া বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর পর তা প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিধিমালাটি চুড়ান্ত করা হয়নি।

চুক্তির পর পুলিশ কনষ্টেবল পদে মোট ৬৭১ জন এবং ট্রাফিক সার্জেন্ট পদে ১১ জনকে ভর্তি করা হয়। কোন কোন জেলায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সহায়ক হলেও বিভিন্ন স্থানের পুলিশ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অনুকুল না হওয়ায় পুলিশ কনষ্টেবলরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন এবং এর প্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক পুলিশ কনষ্টেবল চাকুরী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বদলীর জন্য বার বার দাবী করা সত্ত্বেও কিছু মুখ্যত বদলী ছাড়া সরকার সে বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট সমিতির সদস্যদের চাকুরীতে নিয়োগ বিষয়ে বয়স ৪০ বৎসর পর্যন্ত তিন বছরের জন্য শিথিল করার সরকারী নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং তিন বছর মেয়াদ পর্যাপ্ত ছিল না।

এই ধারার (চ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

এই ধারা মোতাবেক ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প সরকারের নিকট জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রকল্পসমূহের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ এখনো গৃহীত হয়নি। দাখিলকৃত উক্ত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের বিষয়ে ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০০ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৫ (পনের) কোটি টাকার সংস্থান ও এতদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আজ অবধি এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

## সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৭ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে 'আঞ্চলিক পরিষদ' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

৫ (পাঁচ) শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে বিগত ৬ বছরে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রচার করছে যে, এযাবৎ ৭১টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। সরকারের চিঠি মোতাবেক ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিবরণ নিম্নরূপ –

| পত্র | সূত্র | প্রত্যাহৃত ক্যাম্প সংখ্যা |
|---|---|---|
| পাচবিম(সম-১)১০৩/৯৮/৮৬ তারিখ ১৫/০৪/৯৯ | সেনা সদর দপ্তর, ২০ আগষ্ট'৯৮, ৩ সেপ্টেম্বর'৯৮ | ১০টি |
| | ২ মার্চ'৯৯ | ১টি |
| | ২২ মার্চ'৯৯ | ৮টি |
| | ২৫ মার্চ'৯৯ | ২টি |
| পাচবিম(সম-১)১০৬/৯৮/১৩০ তারিখ ১০/০৬/৯৯ | --- | ১০টি |
| | **মোট** | **৩১টি** |

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংঘাতকালীন সময়ে জারীকৃত সেনাশাসন এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে। অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, শান্তকরণ প্রকল্পসহ বহিরাগত সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, আশ্রায়ণ প্রকল্প, রাস্তাঘাট মেরামত ও নির্মাণ, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইত্যাদি সাধারণ প্রশাসনের কার্যক্রমে কর্তৃত্ব করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেক পোষ্ট

বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো যাত্রীবাহী বাস লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ গ্রামাঞ্চলে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে।

এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু চুক্তির এই ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি।

## সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ

এই খন্ডের ১৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা হবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ও আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয় হতে লিখিতভাবে বার বার অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই খন্ডের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী; ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ; ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি; ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি; ৮) সাংসদ, বান্দরবন; ৯) চাকমা রাজা; ১০) বোমাং রাজা; ১১) মং রাজা; ১২) তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

এই ধারা অনুসারে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে উপ-মন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়েছে। দু'বছরের অধিক জোট সরকারের মেয়াদ অতিক্রান্ত হলেও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য এই ধারা মোতাবেক উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়নি। অপরদিকে চুক্তি মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ মনিটরিং করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি ২০০২ উপলক্ষ্যে

**পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে**

# আলোচনা সভা

**ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তন ॥ ২ ডিসেম্বর ২০০২**

গত ২ ডিসেম্বর ২০০২ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরার সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে দেশের বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, উন্নয়ন কর্মী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানিত আলোচকবৃন্দের প্রদত্ত বক্তব্য এই অংশে পত্রস্থ করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি ২০০২ উপলক্ষ্যে
**পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে**

# আলোচনা সভা

## আলোচকবৃন্দের নাম

- জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
- রবীন্দ্র নাথ সরেন, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
- মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, সহ-সভাপতি, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ
- মামুনুর রশীদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
- মতিউর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো
- নুরে আলম জিকু, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ
- অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাঃ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ
- বজলুর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ
- মেসবাহ কামাল, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রমোদ মানকিন, সংসদ সদস্য ও সভাপতি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এসোশিয়েশন
- খুশী কবির, নির্বাহী পরিচালক, নিজেরা করি
- আব্দুল জলিল, প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
- মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
- আ স ম আব্দুর রব,প্রধান উপদেষ্টা, জাসদ
- মেজর জেনারেল (অব:) সি আর দত্ত, সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ
- হাসানুল হক ইনু, সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)
- ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- রাশেদ খান মেনন, সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
- ড. কামাল হোসেন, সভাপতি, বাংলাদেশ গণফোরাম
- শক্তিপদ ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক,পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

# পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক

**জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)**
**সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি**

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভার সংগ্রামী সভাপতি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত সুধী নেতৃবৃন্দ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আদিবাসী ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবী জানিয়ে এবারের চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় বৃহত্তর পরিসরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে তথা তিন পার্বত্য জেলার জেলা সদরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সম্মানিত সুধী ও নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এ চুক্তির বাস্তবায়ন এবং তার প্রেক্ষিতে পার্বত্য অঞ্চলের যে সামগ্রিক পরিস্থিতি সবকিছু মিলিয়ে আমি আজকের এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। আলোচনায় মূল বিষয়ে আসার আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। আপনারা অবগত আছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন সময়ে বাংলা বা বাংলাদেশের শাসনাধীনে ছিল না। পার্বত্যাঞ্চল ছিল সম্পূর্ণভাবে একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং সেখানকার মানুষরা তাদের জাতীয় জীবনকে বাংলার মানুষের জীবন ও জীবিকার বাইরে থেকেই জীবন ও জীবিকা নির্ধারণ করে এসেছিল।

স্বাধীন রাজার আমলে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ী মানুষ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-নিপীড়নে ছিল। বৃটিশের শাসনামলে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শাসন-শোষণে ছিল। আর অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদী শাসন-শোষণে পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ী মানুষ, আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠী বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে বাধ্য হচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলের যে বাস্তবতা, স্বাধীন রাজার আমলে বা পরবর্তী আমলে বা তৎপরবর্তী পাকিস্তান শাসনামলে এবং অধুনা বাংলাদেশের আমলে যদি প্রত্যক্ষ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে চলেছে সকল প্রকারের শোষণ-নিপীড়ন-বঞ্চনা। পাকিস্তান শাসনামলে

আমরা দেখেছি- অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে দেশ ভাগের সময় শতকরা মাত্র আড়াইজন ছিল বাংলা ভাষাভাষি বাইরের মানুষ। সেই পার্বত্যাঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে ১৯৪৮ সাল থেকে এবং ৬০ দশকের গোড়ার দিকে যখন কর্ণফুলীর নদীর বুকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মিত হল তখন পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আদিবাসী মানুষের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল ক্ষেত্রে জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই থেকে শুরু হয়েছে পাহাড়ের আদিবাসী মানুষের সংগ্রাম; যে সংগ্রাম বৃটিশ আমলের পাকিস্তান-ভারত বিভক্তির সময়কালের চেয়েও বেশী গভীরতর এবং বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠায় অধিকতর দৃপ্ত শপথে পরিপূর্ণ।

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে যখন কাপ্তাই বাঁধ পার্বত্য মানুষের মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে চতুর্দিকে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হতে থাকে তখন পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের জীবনকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেনি। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই কাপ্তাই বাঁধের কারণে পার্বত্য অঞ্চলের ৪০ হাজার আদিবাসী মানুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং প্রায় ২০ হাজার মানুষ অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মা বা বর্তমানে মিয়ানমারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয়। এটাও অত্যন্ত রূঢ় সত্য যে, সে সময়ে পার্বত্যাঞ্চলের যে জাতীয় নেতৃত্ব- কার্বারী, হেডম্যান, চীফ এ তিন পর্যায়ে গঠিত জাতীয় নেতৃত্ব সামন্ততান্ত্রিক হওয়ার কারণে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল সে বিপর্যয়ের ডাকে তারা সাড়া দেয়নি, এগিয়ে আসেনি। তাই পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী মানুষেরা বিলুপ্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি পাকিস্তান শাসনামলে বৃটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের শাসনবিধি, যেটা পার্বত্য অঞ্চলকে শাসন বহির্ভূত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই শাসনবিধি পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নানাভাবে খর্ব করতে শুরু করে। তাই আমরা দেখতে পাই ৬০ দশকের প্রথম দিকে এই ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বাতিল করার জন্য জাতীয় পরিষদে বিল আনা হয় এবং সেই বিল পাশ হয়ে যায়। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধের কারণে সেই বিল কার্যে পরিণত হতে পারেনি অর্থাৎ ১৯০০ সালের শাসনবিধি বলবৎ রাখতে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়। তবে দেশ বিভক্তির পর ৫০ দশকের গোড়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা গোটা পাকিস্তান শাসন আমলটা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু সেই সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের সচেতন ছাত্র যুব সমাজ বসে থাকেনি।

ঘুণেধরা সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের বিপক্ষে গিয়ে ৬০ দশকের গোড়া থেকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, আশা-আকাঙ্খা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের সচেতন ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সমাজ, যুব সমাজ সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী, মৌলবাদী ইসলামপন্থীরা এবং সেই সাথে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তি পার্বত্য অঞ্চলের সচেতন ছাত্র যুব সমাজকে সশস্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের জন্য একটি নুতন সংবিধান রচিত হতে যাচ্ছে সেই সময়ে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ শাসন ব্যবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করার দাবী জানানো হয়েছিল। ১৯০০ সালের শাসনবিধির অনুরূপ পার্বত্য অঞ্চলের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য আইন পরিষদ সম্বলিত ৪ দফা দাবী জানানো হয়েছিল। কিন্তু তখনকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জাতীয় নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা সেই দাবী গ্রহণ করেননি। সেটা উপেক্ষিত হয়েছিল। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষেরা যারা যুগ যুগ ধরে বিশেষ শাসন ব্যবস্থায় শাসিত ছিল, বিশেষ অধিকার ভোগ করে আসছিল সেই আদিবাসী মানুষের আশা-আকাঙ্খা তখনকার বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে পদদলিত হল, ১৯০০ সালের শাসনবিধি

উপেক্ষা করা হলো এবং পার্বত্য অঞ্চলের ৪ দফা দাবী- আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হলো। পাশাপাশি চললো রাজাকার, মুজাহিদ, মিলিশিয়া দমনের নামে গোটা পার্বত্য অঞ্চলের বুকে নারকীয় সন্ত্রাস। সামরিক শাসন বলবৎ করা হলো। নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগলো। সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের বিরুদ্ধে চলে গেল। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হল এবং এক পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষকে সশস্ত্রভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের দিকে নিক্ষেপ করা হল। আপনারা জানেন, আজকের আলোচনা সভায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ অংশ নিয়েছেন। আমার এই ইতিহাস, সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রেক্ষাপট তুলে ধরার মূল উদ্দেশ্য- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি কেন স্বাক্ষরিত হলো এবং এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কেন এবং পার্বত্যাঞ্চলে দুই দশকের অধিক সময় ধরে যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল সেটারওবা প্রয়োজনীয়তা ছিল কি-না তা পর্যালোচনা করার জন্যে।

বৃটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান শাসনামলে পার্বত্য অঞ্চলে দশ ভাষাভাষি পাহাড়ী মানুষের জাতীয় অস্তিত্ব চরমভাবে বিপন্ন ছিল। ভূমির অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার হারিয়ে যাচ্ছিল, রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে পদদলিত হচ্ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদপদ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক ও সম্প্রসারণবাদী শাসক-শোষকের শোষণ-নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে পারেনি। তাই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্র-যুব সমাজ পার্বত্যাঞ্চলের তথা বাংলাদেশের নিপীড়িত জাতির, মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে শুরু করেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পার্বত্য অঞ্চলের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষেরা এ আন্দোলনে শরীক হন। এমনকি পার্বত্য অঞ্চলে বৃটিশ আমল থেকে বাংলা ভাষাভাষি যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন তারাও এ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে কোন না কোনভাবে সামিল হয়েছিলেন। একটা পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার এ সমস্যা সমাধানে কিছুটা আন্তরিকতা দেখাতে শুরু করলেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে এদেশে নতুন একটি রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠিত হয়। সেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই উদ্যোগ কার্যে রূপায়িত হতে পারেনি। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী মানুষের পক্ষে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের মধ্যে যোগাযোগ এবং শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল এরশাদ সরকারের আমলে ৫ বার, খালেদা জিয়া সরকারের আমলে ১৩ বার এবং পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ৭ বার মোট ২৫টি বৈঠক-সংলাপ অনুষ্ঠানের পর ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সমগ্র বিশ্ব জানে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার, ভূমির অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ৫ বৎসর পূর্ণতা লাভ করেছে। এই ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমরা আলোচনা সভা করছি আর দাবী হচ্ছে-পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই বাস্তবায়নের কথাটা আজ ৫ বৎসর পরেও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কেন? এটার উত্তর এই আলোচনার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে হবে। আমি মনে করি আজকের এই আলোচনা সভায় শ্রদ্ধাভাজন আলোচকবৃন্দ মহামূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনগণের কাছে তা তুলে ধরতে পারবেন। এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বর্তমান সময়ে নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এ চুক্তি মূল্যায়ণ করা হচ্ছে। এ চুক্তি

বাংলাদেশের বিজ্ঞ-বিদগ্ধ জনের সমাজে, রাজনৈতিক মহলেও নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। বুদ্ধিজীবী সুধী সমাজে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সংগঠনে এ চুক্তিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। কেউ কেউ এ চুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন আবার কেউ কেউ চুক্তির বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে চান।

বস্তুতঃ এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি শুধু পার্বত্য অঞ্চলে ভিন্ন ভাষাভাষি পাহাড়ী-বাঙালী স্থায়ী মানুষের জন্য নয়, গোটা বাংলাদেশের জন্য এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তথা বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির শান্তি, উন্নয়নের জন্য এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কারণে প্রাক্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের পক্ষে শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সম্মানিত পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল বাংলাদেশ। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিপক্ষে বলার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করতে পারি না। কারণ পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের জন্যই সরকার এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

আজকে এ চুক্তিকে নানাভাবে আখ্যায়িত করে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে রাখা হয়েছে। আমি যে কথাটা উত্থাপন করতে চাই তা হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন যত দ্রুত সম্ভব হওয়া উচিত। যত দেরী হবে যত চুক্তির বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে ততই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সামগ্রিকভাবে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে পারে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের জনসংখ্যা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের তুলনায় কম হতে পারে কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ তাদের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, যে জীবনধারা সেই জীবনধারা থেকে কোন সময়ে সরে আসেনি। বরঞ্চ পরিবর্তিত বিশ্বের যে অবস্থা সেই অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদেরকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চায়। সমঅধিকার পেয়ে তাদের জীবনকে পরিচালিত করতে একান্তই আগ্রহী। আমি মনে করি বিগত সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে আন্দোলন তাতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এবং পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে যে বিতর্ক আজ অবধি চলছে আমি সেখানে যাচ্ছি না। আমি আজকের এই আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের দিকগুলো আলোচনায় তুলে ধরতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনেকগুলো বিষয় আছে, বিষয়গুলো যদি আমরা মূল্যায়ন করে থাকি তাহলে বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে না। আমি সেই বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করতে যাচ্ছি। এখানে অনেক বিজ্ঞ আলোচক আছেন যাদের পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা আছে। তাই তাদের মূল্যবান বক্তব্য আমাদের জানতে হবে। এ আলোচনা সভায় পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেকেই উপস্থিত আছেন। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষের যে সমস্যা সমতলের আদিবাসী মানুষেরও সে একই সমস্যা। এখানে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের আলোকে আলোচনা সমতলের আদিবাসীদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা নতুনভাবে উদ্দীপ্ত করবে বৈকি।

শ্রদ্ধেয় সুধী ও নেতৃবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ, আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়, যে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান হতে পারে না, অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে না সেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তার প্রধান কথা হচ্ছে- পার্বত্য অঞ্চলের যারা পাহাড়ী বাঙালী স্থায়ী মানুষ আছে তাদের প্রতিনিধিত্বশীল একটা শাসন ব্যবস্থা তারা পেতে চেয়েছেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে আমরা দেখেছি সেখানে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি জেলা পরিষদ এবং সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে একটা আঞ্চলিক

পরিষদ গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী পাহাড়ী বাঙালী মানুষের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ এ দুটো আইন শুধু জাতীয় সংসদে পাস হয়নি; সেটা গেজেট আকারে ১৯৯৮ সালে মে মাসে বিগত সরকার প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে যতটুকু দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যে আরো বিধি- প্রবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বিগত শেখ হাসিনা সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বর্তমান সরকার এই বিধি-বিধান প্রণয়নে কোন ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ আমরা দেখেছি সেই বিধি-প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া ছিল সে প্রক্রিয়াকে সরকারীভাবে বাধাগ্রস্ত করার জন্য একটা বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে যদিও যথেষ্ট দায়িত্ব-ক্ষমতা আইনগতভাবে দেওয়া আছে তথাপি পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, সামগ্রিক জীবনের উন্নয়নের জন্য যতটুকু এখানে আইনগত ক্ষমতা আছে সেই আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি বিগত ৫টি বছর পর্যন্ত। অন্তর্বর্তীকালীন জেলা পরিষদ- এর প্রত্যেকটিতে চেয়ারম্যানসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট জেলা পরিষদের যারা মেম্বার এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন তারা ক্ষমতাসীন দলে থাকেন। সেজন্য চেয়ারম্যান-মেম্বাররা জেলা পরিষদ কার্যকর করার জন্য যেমনি কোন ভূমিকা নেননি তেমনি সরকার তথা সরকারী পক্ষ থেকে এ জেলা পরিষদকে কার্যকর করার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়ের মধ্যে এই আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদ এখনো বাস্তবায়িত হতে পারেনি পরিপূর্ণভাবে। দ্বিতীয়তঃ চুক্তির অন্যতম মৌলিক বিষয় স্বাধীন দেশের নাগরিকের ভোটাধিকার। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ সেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। চুক্তিতে, আইনে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকারের নির্বাচনের জন্য একটাই মাত্র ভোটার তালিকা হবে এবং এটা সংবিধানসম্মত। কারণ সংবিধানে যে কোন নাগরিকের দুই ধরনের ভোটার তালিকা থাকতে পারে না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই সংবিধান অমান্য করে সরকার দুই ধরনের ভোটার তালিকা প্রণয়নের কথা বলছে; জেলা পরিষদ আর আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য একটা ভোটার তালিকা আর অন্যান্য নির্বাচনের জন্য আর একটা ভোটার তালিকা। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী মানুষের ভোটের অধিকারকে কেন্দ্র করে চলছে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র। হাজার হাজার বহিরাগত মানুষ যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করছে তাদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এযাবৎ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে নির্বাচন কমিশনের যে দায়-দায়িত্ব সে দায়-দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন থেকে পর্যন্ত বিরত থাকতে আমরা দেখেছি। এই ভোটার তালিকা, স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়ে যে ভোটার তালিকা তা এখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

বিগত সংসদ নির্বাচনে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, এমনকি নির্বাচন কমিশনের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলাম। আবেদন করেছিলাম সরকারের কাছে, আবেদন করেছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান সাহেবের কাছে। আমি কথা বলেছিলাম মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে। কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি। তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু কার্যতঃ তার সরকার সেই নির্বাচন গায়ের জোরে, শক্তি প্রয়োগ করে অনুষ্ঠিত করেছেন এবং সেখানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে, ইউপিডিএফ নামে পার্বত্য

অঞ্চলের যে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ এই লতিফুর রহমানের সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই সন্ত্রাসী গ্রুপকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের যে গৌরব সেটা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি। বাংলাদেশ সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সেখানে একজন সন্ত্রাসীকে জেনে শুনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এটা জঘন্যতম মানবাধিকার লংঘন এবং একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এটা একটা অপমানকর অপমানজনক ঘটনা বলে আমরা মনে করি।

যা হোক, সম্মানিত সুধী নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণভাবে প্রায় লক্ষাধিক পাহাড়ী উদ্বাস্তু পরিবারের যে পুনর্বাসন সেটা অবাস্তবায়িত রয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে একটা টাস্ক ফোর্স ছিল সেই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান তার দায়িত্ব পালন না করে তথা বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে জেনারেল জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে যে চার লক্ষাধিক বহিরাগত, পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইনকে লংঘন করে, ভূমির রীতি-নীতি-পদ্ধতিকে লংঘন করে যে তথাকথিত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে পুনর্বাসনের চেষ্টা করে এবং সেই টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্তক্রমে বহিরাগত ৩৮,১৫৬ পরিবারকে সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, আমরা প্রতিরোধ করেছিলাম টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান এর সেই কর্মকান্ডের, তিনি তার দায়িত্বের বাইরে সরকারের বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের অন্যতম একজন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলেন। আজকে সেই ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থীদের মধ্যে ৩,০৫৫টি পরিবার পুনর্বাসন পায়নি। তারা তাদের ভিটেমাটি ফেরত পায়নি, তাদের জায়গা-জমি ফেরত পায়নি। তারা তাদের স্ব স্ব গ্রামে ফিরে যেতে পারেনি। তারা পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ভাসমান জনগোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে প্রায় লক্ষাধিক আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তু পরিবারও আজ ভাসমান অবস্থায় সীমাহীন দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। সেই পুনর্বাসনের কাজ শেষ হয় নাই।

চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদে অথবা কোন অর্ডিন্যান্স জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর জন্য যদি কোন আইন করতে চান তাহলে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার আঞ্চলিক পরিষদের কোন পরামর্শ গ্রহণ না করে তাড়াহুড়ো করে একটা আইন পাস করে গেলেন। সেই আইন ছিল চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক, সে আইন ছিল ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিমূলক নয় বরঞ্চ ভূমি বিরোধকে আরো জটিলতর করার লক্ষ্যে একটা আইন। তাই আমরা সেই আইনে সংশোধনীর জন্য বর্তমান সরকারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছি এবং ইতোমধ্যে এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের উপর সরকারীভাবে দুইবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উনিশটি সংশোধনী পেয়েছি। আঠারটা সংশোধনী নিষ্পত্তি হয়েছে কিন্তু একটা সংশোধনী এখনো বাকী আছে এবং এ সংশোধনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সংশোধনীটি হচ্ছে যে- ভূমি কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব-ক্ষমতা প্রয়োগ করবে সেটাই। সেটা সিদ্ধান্ত হয়নি। শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যে আইন করা হয় সেই আইনে ভূমি কমিশনে তার কার্য পরিধির ক্ষেত্র সীমিত করে দেওয়া হয়। সেখানে হচ্ছে আমাদের আপত্তি। সেখানেই ছিল আমাদের সংশোধনীটি। কথা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই সংশোধনী নিষ্পত্তির জন্য বৈঠক আহবান করবেন। কিন্তু সেই বৈঠক এখনো অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তাই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং ভূমি কমিশন কার্যকর করার জন্য যে আইন করা হয়েছে সে আইন এখনো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই ভূমি বিরোধ সেখানে দিন দিন সামগ্রিক

পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে, বিনষ্ট করছে সেখানকার মানুষের জীবন জীবিকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আরও মৌলিক বিষয়ের মধ্যে আর একটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে ৬টি সেনানিবাস থাকবে। দীঘিনালা, রুমা, আলিকদম এই তিনটি সেনানিবাসসহ তিন পার্বত্য জেলার জেলা সদরে ১টি করে মোট ৬টি সেনানিবাস থাকবে এবং অবশিষ্টগুলো পর্যায়ক্রমে সরিয়ে আনা হবে। সেনা ক্যাম্পগুলো ৬টি সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেয়ার এই বিষয়টি আজ অবধি বন্ধ হয়ে আছে। বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ৩১টি ক্যাম্প সরিয়ে আনা হয়। অবশ্য সরকার দাবী করতেন ৭১টি ক্যাম্প সরানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের হাতে মাত্র ৩১টি ক্যাম্পের সরকারী কাগজপত্র জমা আছে। অথচ সেখানে পার্বত্য অঞ্চলে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প, আনসার ক্যাম্প, ভিডিপি ক্যাম্প এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প পাঁচ শতাধিক রয়ে গেছে। আজকে সেই অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো সরিয়ে আনা হয়নি। সর্বোপরি ১৯৮০ দশকের যে অপারেশন দাবানল পার্বত্য অঞ্চলের কাউন্টার ইনসারজেন্সির অন্যতম একটা দিক হিসেবে কার্যকর ছিল শেখ হাসিনা সরকার বিদায় নেবার আগে অপারেশন দাবানলের পরিবর্তে আর একটি নির্দেশ জারী করে যান। সেই নির্দেশটা হলো অপারেশন উত্তরণ। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম, যাতে এ অপারেশন উত্তরণ এর যে নির্দেশ সেটা দেয়া না হয়। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের মাথার উপর আবার এই সামরিক শাসন এই অপারেশন উত্তরণ নামে তিনি তার কাজ সম্পন্ন করে গেছেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী এই অস্থায়ী ক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনার মাধ্যমে সরিয়ে আনার কাজটি বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বোপরি এই অপারেশন উত্তরণ আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সামরিক শাসন বিরাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে বিষয়গুলোর মধ্যে একটা দিক হচ্ছে যারা চুক্তির মাধ্যমে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে অথবা বিভিন্ন মামলার মুখোমুখী হয়েছে, বিচারের রায়ের শিকারে পরিণত হয়েছে তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা আন্দোলনে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যত প্রকারের মামলা রয়েছে, যত প্রকারের বিচারের রায় রয়েছে সেগুলোর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু সেই সাধারণ ক্ষমা এখনো কার্যকর করা হয়নি। আংশিক কার্যকর করা হয়েছে। এখনো সেনা আদালতে যে সমস্ত মামলা করা হয়েছিল এবং বিচারের রায় দেয়া হয়েছিল সেই মামলার রায়ের খবর আমরা জানি না। আমরা সরকারের কাছে বার বার আবেদন করেছিলাম আমরা সেই মামলার খবর জানতে চাই। আমরা যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাই, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে, সে সমস্ত কাগজপত্র আমাদের হাতে নেই। এগুলো সেনাবাহিনীর হাতে থাকবে। আমরা যখন সেনাবাহিনীর কাছে যাই সেনা কর্তৃপক্ষ বলতে থাকে যে, সে সমস্ত কাগজপত্র আমাদের কাছে থাকার কথা নয়। এভাবে এই সাধারণ ক্ষমা নিয়ে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত-নিপীড়িত অথচ অধিকারকামী মানুষদেরকে নিয়ে। আজকে এই সাধারণ ক্ষমার বিষয়টা অবাস্তবায়িত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে তা পরিবীক্ষণের জন্য, সেটা দেখাশুনা করার জন্য, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি নামে একটা কমিটি ছিল। কিন্তু সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বর্তমান সরকার আমলেও সেটা এখনো গঠন করা হয়নি। অথচ এই চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর কোন মহল দায়িত্ব নিতে চান

না। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলুন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলুন, এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলুন, কোন কার্যালয় কোন দপ্তর এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে কেউ দায়িত্ব নিতে চান না। আজকে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরী। এই চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একজন প্রতিনিধি থাকবেন যিনি এই কমিটির প্রধান হবেন এবং থাকবেন ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের যে টাস্কফোর্স সেই টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি। এই তিন সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এখনও এটা পুনর্গঠিত হয়নি।

সর্বোপরি টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যানের পদ এখনও খালি আছে। সেটাও পুনর্গঠন করা হয়নি। সবচেয়ে যে বিষয়টা আশ্চর্যের বিষয় সেটা হচ্ছে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যেটা মন্ত্রী পরিষদের অন্যতম একটা অংশ সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আজ অবধি আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে যে দায়িত্ব ক্ষমতা সে দায়িত্ব ক্ষমতা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করা হয়নি বা সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

সম্মানিত সুধী ও নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি, কয়েকটা মাত্র আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে সমস্যার কারণে আজকের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের দাবীতে আমাদের এ আলোচনা সভা। বিগত শেখ হাসিনা সরকার ৩ বছর ৮ মাস সময় পেয়েছে। কিন্তু সে সময়টুকু সরকার সৎ ব্যবহার করেনি। আমরা দেখেছি বরঞ্চ সরকারের একটা বিশেষ মহল এই চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেই বিশেষ মহল বরাবরই সচেষ্ট ছিল এবং সে কারণেই আমরা দেখি পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জন্মলাভ হয়েছে ইউপিডিএফ নামক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল। এই সন্ত্রাসী গ্রুপ জন্মলাভ করেছিল বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে এবং এই সরকারই সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপকে লালন পালন করেছিল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বর্তমানে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকারও সেই ইউপিডিএফকে লালন পালন করে চলেছে এবং গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। যে সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে জনসংহতি সমিতির সদস্যবৃন্দ, জনসংহতি সমিতির পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে যারা কথা বলেন তারা। শুধু তাই নয়, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্য ইউপিডিএফ কর্তৃক বিদেশী অপহরণ করানো হয়েছিল এবং সেখানে সরকারের বিশেষ মহলের একটা মদত ছিল সেটা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজকে সেই ইউপিডিএফ রাজধানীর বুকে তাদের তথাকথিত রাজনৈতিক কাজ করতে পারে অথচ পার্বত্য অঞ্চলে তারা অস্ত্র হাতে মানবাধিকার লংঘন করছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নকামী শান্তিকামী মানুষকে তারা হত্যা করছে। এই পর্যন্ত ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির সদস্য ৩১ জন এবং চুক্তি পক্ষের সক্রিয় সমর্থক ১৯ জনকে হত্যা করেছে। সর্বমোট ৫০ জনকে হত্যা করেছে। কয়েক শত ব্যক্তিকে আহত করেছে। চাঁদাবাজি করে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। আজকে আমরা দেখি এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সে অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বাধাগুলি কোথায় আমি দু'একটি কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যে বাধা তাতে দেখা যায় যে, এর পেছনে অনেকগুলো শক্তি বাধা হিসেবে দন্ডায়মান। তন্মধ্যে যেটা সবচেয়ে আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল যে সরকারের আন্ত

রিকতার অভাব, সদিচ্ছার অভাব। বিগত যে সরকারের আমলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে যে সরকারগুলো আমাদের দেশে শাসনভার গ্রহণ করেছে কোন সরকারের মধ্যে আমরা দেখিনি, অনুভব করিনি যে তারা আন্তরিক এই চুক্তি বাস্তবায়নে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে- বিগত সরকার থেকে শুরু করে বর্তমান সরকার পর্যন্ত এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম বাধা এবং প্রধান বাধা হিসেবে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ের উপর যে দায়িত্ব-কর্তব্য যেটা সরকারীভাবে পালিত হয়েছে সেখানে স্তরে স্তরে দেখতে পাই নানা ধরনের বাধা এবং সমস্যা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্যতম বাধা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে সমস্ত সরকারী কর্মকর্তা কাজ করছেন তাদের অধিকাংশই এই চুক্তি বিরোধী। তারা এই চুক্তি বাস্তবায়িত হোক তা চান না। তারা যখনই পার্বত্য অঞ্চলে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তারা আর বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তা থাকেন না। তখন তাদের পরিচয় হয়ে যায় হয় বাঙালী নয়তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সেখানে তারা পাহাড়ে এদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলে যে রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করেছে পাহাড়ী-বাঙালী নামক তথাকথিত যে রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করেছে, সেই রাজনৈতিক ধারার সাথে একাত্ম হয়ে এই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সেই বাঙালী রাজনীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন এবং এই কারণে আমরা দেখতে পাই এই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সকল ক্ষেত্রে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন।

চুক্তি বাস্তবায়নে আরও অন্যতম বাধা হচ্ছে যে ওখানে অনেকগুলো মৌলবাদী সংগঠন আছে। সেই মৌলবাদী সংগঠনগুলো বহিরাগত লোকদের সাথে আঁতাত করে সংঘবদ্ধ হয়ে যাতে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতামূলক উগ্র জাতীয়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সম্প্রতি রাঙ্গামাটির বুকে তথাকথিত শান্তি, উন্নয়ন ও প্রগতির নামে বাংলাদেশ সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং নেতৃত্বে যে আলোচনা সভা বা সমাবেশ করা হয়েছে সেখানে মৌলবাদী সংগঠনগুলোর বাস্তব ও সার্থক প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। এবং সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করার, পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী পাহাড়ী বাঙালীদের জীবন-জীবিকার উপর চরমভাবে আঘাত হানার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার যে ষড়যন্ত্র তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যেহেতু কার্যকর হয়ে উঠেনি তাই এই পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয় যতটুকু ভূমিকা রেখেছে সকল ভূমিকা আমরা দেখেছি যে সেটা এই চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিরোধী।

চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে আমরা দেখি যে, সেখানে সশস্ত্র নিরস্ত্রভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিরোধিতা করা হচ্ছে। সেখানে সশস্ত্রভাবে শুধু ইউপিডিএফরা নয়, সেখানে সাধারণ বহিরাগত বাঙালীদের মধ্যেও আমরা দেখি সশস্ত্র তৎপরতা। এটা এ দেশবাসী অনেকেই হয়ত জানে না। শুধু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় ইউপিডিএফ নামধারীরাই শুধু সশস্ত্রভাবে চুক্তি বিরোধিতা করছে, প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। পার্বত্য অঞ্চলে নির্বাচিত ব্যক্তিরাও আমরা দেখেছি রাঙ্গামাটির বুকে প্রকাশ্যভাবে হাতিয়ার নিয়ে তারা সভা সমাবেশ করতে। এটা সুস্পষ্ট, পার্বত্য অঞ্চলে যারা স্থায়ী বাসিন্দা নয় সেই বাংলা ভাষাভাষির মধ্যেও সশস্ত্র তৎপরতা আছে এই চুক্তি বাস্তবায়ন যাতে হতে না পারে।

এই চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা হিসেবে আর একটা দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ। আমরা সেখানে দেখি যে তাদের মধ্যে অংশ বিশেষ চুক্তির পক্ষে কথা বলেন আবার অংশ বিশেষ দেখি আমরা চুক্তির বিপক্ষে। যেহেতু এই সেনাবাহিনী সরকার নিযুক্ত করেছে তার বিশেষ উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই সেনাবাহিনী যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত আছেন তারা চুক্তি সফল বাস্তবায়নে যে প্রক্রিয়া সে পক্ষে তারা থাকতে

পারে না। যে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। যে সেনাবাহিনী জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীনে বিশ্বের শান্তিবাহিনীর ভূমিকা পালন করছে। সেই সেনাবাহিনীকে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে আমাদের দেশের সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক তার দেশেরই নাগরিককে অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সুতরাং আজকে পার্বত্য অঞ্চলের বুকে মানুষের যে যন্ত্রণা, যে বেদনা সেটা এক কথায় এক ঘন্টায় একদিনে বলা যেতে পারেনা। আমাদের বুকে যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। আজকে যে সেনাবাহিনী আমাদেরকে রক্ষা করবে, যে সেনাবাহিনী আমাদের দেশকে রক্ষা করবে, যে সেনাবাহিনী আমাদের সংবিধানকে রক্ষা করবে, যে সেনাবাহিনী আমাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে, সে সেনাবাহিনীকে আজকে আমাদের দেশের সরকার, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার তার দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। এটা বিশ্বাস করা যায় না আমাদের দেশের মত একটা স্বাধীন, সার্বভৌম একটা সভ্য দেশে।

যা হোক, সম্মানিত সুধী নেতৃবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বাধাগুলো যেগুলো অপসারণ করা না হলে এ চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে না। এখানে তাই বাংলাদেশের আপামর জনগণের কাছে এ চুক্তি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা। এ চুক্তিকে নানাভাবে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অনেক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল, সংগঠন আছেন যারা চুক্তিকে কালো চুক্তি বলেন। এ চুক্তিকে বিভেদমূলক চুক্তি বলেন, এই চুক্তিকে বাঙালীদের অধিকার হরণের কথা বলেন। এ চুক্তি বাঙালীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে- এই ধরনের নানা কাল্পনিক কথাবার্তা বলে, অবাস্তব কথাবার্তা বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে তারা বাঁধা সৃষ্টি করছেন। পক্ষান্তরে, পাকিস্তান আমলে গৃহীত অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার যে ষড়যন্ত্র সে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার জন্য আজকে বাংলাদেশের সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী সেটা অব্যাহত রেখে চলেছে।

যা হোক, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছি না। আমি শুধু পরিস্থিতির উপর দু'একটা বাক্য সংযোজন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সামগ্রিক পরিস্থিতি, আমি মনে করি এটা অস্বাভাবিক, সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক। অরাজকতা বিরাজ করছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। আইনগতভাবে কে নেতৃত্ব দেবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল ক্ষেত্রে, সেটা আইনগতভাবে নির্ধারিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। কিন্তু সেই জেলা পরিষদ সেই আঞ্চলিক পরিষদের কোন স্থান সেখানে নেই। সেখানে সর্বোচ্চ স্থান হচ্ছে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর কোন সদস্য যদি সে এলাকার কোন মানুষের জীবন হানিও করে থাকে তার কোন বিচার পাবার সম্ভাবনা নেই। সেখানে প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্তে পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী পাহাড়ী বাঙালী জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। আজকে আমাদের কারোর নিরাপত্তা নেই। আমাদের যে কোন মুহূর্তে আমাদের প্রাণ হরণ হতে পারে। আজকে শুধু ইউপিডিএফ নয়, সেখানে মৌলবাদী শক্তি সক্রিয়। সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদী, উগ্র ধর্মান্ধ শক্তিও খুবই সক্রিয়। আজকে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা বিশাল কারাগারে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বাঙালী আমরা যারা স্থায়ী বাসিন্দা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক কারাগারে আমরা আমাদের মূল্যবান জীবন, মানুষের মত বেঁচে থাকার যে জীবন সে জীবনকে হারানোর আতঙ্কের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

# শান্তি চুক্তিতে যে কথাগুলো ছিল, যে অঙ্গীকারগুলো ছিল, সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না; চুক্তির প্রতিটি ধারা লংঘন করা হচ্ছে

**রবীন্দ্রনাথ সরেন**
**সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও**
**সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম**

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ৫ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভার মাননীয় সভাপতি এবং মঞ্চে উপবিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সারা বাংলাদেশ থেকে আগত আদিবাসী নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, সুধী মন্ডলী। আজকে ২রা ডিসেম্বর। এই ডিসেম্বর মাস হচ্ছে আমাদের বিজয়ের মাস। সে কারণে আমি প্রথমে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সাথে সাথে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই জুম্ম জনগণের অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমার প্রতিও। আজকে যদি আমরা দেখি বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত ভয়াবহ। জুম্ম জনগণ আশা করেছিল, তাদের আকাঙ্খা ছিল এই স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, লড়াই করেছি এবং এই দেশে আমাদের অধিকার বাস্তবায়িত হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা দেখছি শান্তি চুক্তিতে যে কথাগুলো ছিল, যে অঙ্গীকার ছিল, যে জিনিষগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল সেটি করা হচ্ছে না; চুক্তির প্রতিটি ধারা লংঘন করা হচ্ছে।

আজকে আমরা দেখি পার্বত্য চট্টগ্রামকে সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে, সেখানকার আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, বিতাড়িত হচ্ছে, ভিটেছাড়া হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে। আমরা তেমনিভাবে দেখতে পাই সারা বাংলাদেশে আদিবাসীদের অবস্থা। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা যারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছে, লক্ষ লক্ষ আদিবাসী বসবাস করছে, আমরা দেখি তাদেরও একই অবস্থা। তারাও প্রতিদিন নির্যাতিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। তাহলে আমরা কি বলতে পারি না এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আদিবাসীরা কেন অংশগ্রহণ করেছিল? কেন স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? আজকে আমরা এই স্বাধীন দেশে পরাধীন জীবন যাপন করছি। আজকে আমরা রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা নিদারুনভাবে অবহেলিত। আজকে সরকারী পক্ষ থেকে কোন সুযোগ, কোন অধিকার তারা পাচ্ছে না। আমরা দেখেছি আদিবাসীরা যেখানে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে, সেই ভিটা থেকেও আজকে বিতাড়িত হচ্ছে।

আমরা বলতে পারি, আলফ্রেড সরেনকে হত্যা করে সেই বড় উদাহরণ উত্তরবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আলফ্রেড সরেনের বিচার আদৌ বাংলাদেশের মাটিতে হবে কিনা; যারা খুনী, যারা হত্যা করলো তাদের বিচার হবে কিনা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। সেই কারণে আমি বলতে চাই, আদিবাসী বন্ধুদের আমি বলতে চাই, আমাদের আরও অনেক সংগ্রাম করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি আদিবাসীদের সাথে এদেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক দল, প্রগতিশীল মানুষ আমাদের সঙ্গে

আছেন, আদিবাসীদের অধিকারের জন্য কথা বলেন, লড়াই করেন, সঙ্গে থাকেন। সেই কারণে আমি বিশ্বাস করি এই স্বাধীন দেশে আদিবাসীরা পরাধীন থাকতে পারে না। আমরা পরাধীনতায় থাকতে চাই না।

আমরা দেখছি সারা বাংলাদেশে আজকে আদিবাসীদের কি করুণ অবস্থা, কি করুণ চিত্র। আজকে সরকারী চাকুরীতে আদিবাসীদের কোন সুযোগ নেই। আজকে লেখাপড়ার কোন সুযোগ নেই। আদিবাসীরা ভূমিহীন। আদিবাসীরা যে জমিতে শত শত বৎসর ধরে বসবাস করছে, সেই জমি থেকে তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, তাদের জমির মালিকানাস্বত্ব জাল হচ্ছে, ভূয়া দলিল হচ্ছে। এই হচ্ছে আদিবাসীদের অবস্থা।

আমি বলতে চাই, আমাদের আরও সংগ্রাম করতে হবে, আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং এই আশা এই আকাঙ্খা আমি দেখতে পাই, এই আশা আমি করতে পারি। আজকে আমরা সন্তু লারমার মত একজন বলিষ্ঠ নেতা পেয়েছি। আপনারা আসুন, আমরা একসঙ্গে কাজ করি, আদিবাসীদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। আমরা স্বাধীন হব, আদিবাসীরা অধিকার ফিরে পাবে, আমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবো এই আশা রেখে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

# আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন চাই

**মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার**

**সহ-সভাপতি, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ**

রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তিন পার্বত্য জেলা এবং সারা বাংলাদেশ থেকে আগত আজকের আলোচনা সভায় উপস্থিত সবাইকে আমার সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আজকে এই ২রা ডিসেম্বর চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আপনাদের সামনে দুয়েকটি কথা আমি তুলে ধরছি। ১৯৯৭ সালে যে চুক্তি করা হয়েছে সেই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী স্থায়ী বাঙালীদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। আজকে যারা মৌলবাদী এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা বলছেন, বাঙালীদের কথা বলছেন, তাদের জানা উচিত ছিল এই চুক্তিতে বাঙালীদের অধিকার ফিরে এসেছে। বৃটিশ আমলে যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে একটি ধারায় লেখা আছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যে কোন মুহূর্তে ডেপুটি কমিশনার একজন বাঙালীকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন। সেখানে বাঙালীদের কোন অধিকার রাখা হয় নাই। ১৯৬৩ সালে সেই মৌলবাদী পাকিস্তান সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালীদের কোন অধিকার রাখা হয় নাই।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচিত হয়েছে। আজকে যারা মৌলবাদী, বাঙালী জাতীয়তাবাদ নিয়ে কথা বলছেন তারা তখন কোথায় ছিলেন? এই ১৯০০ সালের হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েলের উক্ত ধারা বাতিল করার জন্য বলেন নাই। কিন্তু তারা বলছেন চুক্তি বাতিল করুন। চুক্তিকে কালো চুক্তি বলছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালীর সবারই নেতা, আজকের প্রধান আলোচক সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালী আছেন বলে স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের অধিকার ফিরে এসেছে। বিভিন্ন মহল, কিছু কুচক্রী বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা তুলে বলছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের ভূমি কেনার অধিকার নাই, কোথাও বলা হচ্ছে বাঙালীদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক, কোথাও বলা হচ্ছে বাঙালীদেরকে হিল ট্র্যাক্টস থেকে, স্থায়ীভাবে যারা বসবাসকারী তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করা হবে। কোথায় লেখা আছে চুক্তিতে! আপনারা এই সমস্ত কথা বলে চুক্তির বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করছেন। আমি সরকারকে বলতে চাই, চুক্তি বাস্তবায়ন করা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালীদের অধিকার আদায়ের জন্য একটা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন গড়িমসি করা হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালীদের সাথে বেঈমানের সামিল হবে। চুক্তি বাস্তবায়নে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা- আমরা চুক্তির বাস্তবায়ন চাই। আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

## পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটিকে আমাদের Main stream পলিটিক্সের ইস্যুর সঙ্গে একীভূত করে যেন আরো শক্তিশালী করা হয়

**মামুনুর রশীদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব**

শান্তি চুক্তির ৫ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের সভায় সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ আলোচক এবং রাজনীতিকবৃন্দ এবং আমার আদিবাসী ভাই বোনেরা। গত বৎসর এই দিনে আমি বাঘাইছড়িতে গিয়েছিলাম শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তিতে এবং সেখানে অনেক মানুষের সামনে এবং পাহাড়ী বাঙালী সবাই সেখানে ছিলেন, তাদের সান্নিধ্যে এসে শান্তি চুক্তির যে ইমপ্যাক্টটা ঐ পার্বত্য অঞ্চলে সেটা কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। মানুষের প্রত্যাশা এবং সেই সঙ্গে বঞ্চনার যে একটা সম্মিলিত চিত্র, সে চিত্রটি তখন দেখতে পেয়েছিলাম। যখন শান্তি চুক্তি হলো, তখনও এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ সময় যে ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে, পাহাড়ীরা মৃত্যুবরণ করেছে, বাঙালীরা মৃত্যুবরণ করেছে। এই দিনগুলোতেও এর মধ্যে যে একটা ধোঁয়াছা সৃষ্টি করা হয়েছিল সে অবস্থাটা কোন অবস্থাতেই যেন অবসান ঘটছে না।

শান্তি চুক্তি যখন হলো তখন আমরা যে সমস্ত এলাকায় মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা কোথায় যেন একটা অদৃশ্য অবস্থাতেই শান্তি চুক্তি বাস্ত হয়ত একটা বিশ্ব পরিস্থিতিরও ইন্ডিয়ানরা অথবা অস্ট্রেলিয়াতে একের পর এক ষড়যন্ত্রের ধ্বংসই করে দেয়া হয়েছে। জেগে উঠেছে, বিশেষ করে এটা সত্যিই আমাদের জাতির তাদের যোগ্য নেতৃত্ব রয়েছে, হয়েছে এবং সে সশস্ত্র করতে পারছেন।

**আজকে বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন এবং আমরা অবিলম্বে চাই যে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হোক। পাহাড়ী জনগণ তাদের অধিকার ফিরে পাক। আলফ্রেড সরেনের হত্যার বিচার হোক।**

আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। গিয়েছি, জনসভায় অংশ নিয়েছি, করেছি শান্তি চুক্তির বিষয়টি। কিন্তু ব্যাপার রয়ে গেছে, যারা কোন বায়িত হতে দেয় না এবং এ সঙ্গে মিল আছে। যেমন, আমেরিকাতে রেড অ্যাবরিজিনাল্সদেরকে ক্রমাগতভাবে মাধ্যমে তাদেরকে এখন বলতে গেলে আবার অনেক জায়গায় আদিবাসীরা বাংলাদেশে আদিবাসীদের যে জাগরণ ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা। সংগঠিত লড়াই হয়েছে, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগ্রামের মধ্যেও তারা কিছু অর্জনও

আমার মনে হয় যে আর একটি বিষয় যেটা আমি শ্রদ্ধেয় সন্তু লারমাকে বারবার বিভিন্ন জনসভায়ও বলেছি। আজ অবশ্য তিনি তার আলোচনার মধ্যে সমগ্র দেশটার আংশিক চিত্রটাও তুলে ধরেছেন। নির্যাতন, নিপীড়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে হচ্ছে, আমাদের চেয়ে বেশী হচ্ছে, বঞ্চনা হচ্ছে। কিন্তু সারা দেশে কি নিপীড়ন, নির্যাতন ঘটছে না! কাজেই সেনাবাহিনীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তাকে বার বারই বলেছি যে আপনি শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতা থাকবেন কেন, সারা বাংলাদেশের নেতৃত্বে

চলে আসেন এবং Main stream এর আন্দোলনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে যদি আমরা একীভূত করতে না পারি, আমরা আদিবাসীদের আন্দোলন যদি একীভূত করতে না পারি তাহলে যে গোপন শক্তি, যে অদৃশ্য শক্তি বারবার এর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এর কিন্তু অবসান হবে না।

আমি আশা করবো আজকে বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা তাদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন এবং আমরা অবিলম্বে চাই যে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হোক। পাহাড়ী জনগণ তাদের অধিকার ফিরে পাক। আলফ্রেড সরেনের হত্যার বিচার হোক। এগুলো আমাদের জোর দাবী এবং সেই সঙ্গে এখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ আছেন তাদেরকে অনুরোধ করবো পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুটিকে আমাদের Main stream পলিটিক্স এর যে ইস্যু সেই ইস্যুর সঙ্গে একীভূত করে এটাকে যেন আরো শক্তিশালী করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আশু সমাধান কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

# পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে হবে

মতিউর রহমান

সম্পাদক, প্রথম আলো

আজকের এই সভায় সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং অন্যান্য বক্তাবৃন্দ এবং হলে উপবিষ্ট বন্ধুগণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির আজ ৫ বৎসর পূর্ণ হলো। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর আওয়ামী লীগ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদিচ্ছার কারণে এই চুক্তি সই করা সম্ভব হয়েছিল সেইদিন। পাহাড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দিনের রক্তপাত, হানাহানি বন্ধ করতে, স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য আমরা সেদিন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলাম। আমরা তাদেরকে অভিনন্দিত করেছিলাম। কারণ দশকের পর দশক ধরে পাহাড়ী উপজাতি জনগোষ্ঠী শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত হয়েছে। তারা এদেশের নাগরিক। তাদেরও এদেশে সম অধিকার নিয়ে বসবাস করার অধিকার ছিল, আজো আছে। কিন্তু সেই অধিকার প্রদানে আমাদের একের পর এক সরকারগুলো আন্ত রিক ছিল না। আমরা এখন দেখছি চুক্তি স্বাক্ষরের ৫ বৎসর পরও বস্তুত এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার প্রায় চার বছর সময় পেয়েছিল। চুক্তি বাস্তবায়ন নয়, বরং তারা নানাভাবে এই চুক্তির বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। চুক্তি পরিপন্থী কাজ করেছে।

এখন বিএনপি সরকার এক বছরের বেশী সময় তারা পেয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এখনও চুক্তি বাস্ত বায়নের কোন সদিচ্ছা আমরা দেখতে পায় না। বরং এ চুক্তিকে তারা ঝুলিয়ে রেখেছে। চুক্তি বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে। যদিও আগে তারা এ চুক্তি বাতিলের দাবী জানিয়েছিল। এখন তারা সে কথা বলছেন না। আমাদের জোর দাবী পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করতে হবে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন ও দাবীর প্রতি আমাদের সমর্থন আছে এবং আগামীতে আমাদের সমর্থন থাকবে। আর এই আন্দোলন এবং এই প্রক্রিয়া এই চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীর পাশাপাশি কিছু কাজ জরুরীভাবে করা দরকার বলে আমরা মনে করি।

(১) পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই অঞ্চলের উন্নয়নে দেশী বিদেশী সাহায্যদাতা গোষ্ঠী সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে এখনও কোন সুস্পষ্ট উদ্যোগ সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে না দেখা দেয়াই এই উদ্যোগ, এই প্রচেষ্টাগুলি সফল হচ্ছে না। আমরা বলবো সরকার এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে এবং করা হবে, কারণ অনেক পাহাড়ী স্থায়ী বাসিন্দার জমি বেদখল হয়ে গেছে, অনেকে জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে। এতে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, হানাহানি বেড়ে চলেছে। এই বিরোধ নিরসনে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না, কাজ শুরু করা যাবে না। কিন্তু শান্তি চুক্তি বিরোধী একটি গোষ্ঠী নানা রকম সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এই অভিযোগ আজকেও আমরা শুনলাম যে, সরকারের ভেতরের একটি অংশ তাদেরকে সহযোগিতা করছে। সরকারকে আন্তরিকভাবে এসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৪) চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে সেনা ক্যাম্প কমিয়ে আনার কথা ছিল। কিন্তু বিগত ৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার, বর্তমান বিএনপি সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

(৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যিকার উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু করতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকারকে আরও দায়িত্বশীল উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। একই সঙ্গে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৬) পার্বত্য অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীরাও নানা রকম নির্যাতন, নিপীড়ন এর শিকার হচ্ছেন। তাদেরকে অধিকার প্রদানে যথাযথ উদ্যোগ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

আজকে আমাদের এই সমাবেশে বলতে চাই, দীর্ঘদিন দশকের পর দশক ধরে আমরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলাম। আমরা এটা বলতে চাই যে, আগামীতেও তাদের সাথে আমরা থাকবো, তাদের সংগ্রামে, তাদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতা-নেতৃবৃন্দ, জনসংহতি সমিতি বলছে যে, তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আগামীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবেন, তারা শুরু করবেন এবং হয়তো তারা আজকে থেকে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা বলবো পার্বত্য চট্টগ্রাম নেতৃবৃন্দের এই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে আমরা পরিপূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি এবং তাদের সেই আন্দোলনে আমরা তাদের সাথে থাকবো। সবাইকে ধন্যবাদ।

# পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বশাসিত প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে

**নুরে আলম জিকু**

**সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)**

আজকের এই ব্যতিক্রমধর্মী সভার মাননীয় সভাপতি, বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুরা আর সংস্কৃতিসেবী বন্ধুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাই বোনেরা।

যে সমস্যাটার সৃষ্টি হয়েছে, সমস্যার যে আকার ধারণ করেছে, রূপ গ্রহণ করেছে এটার মূলে হলো - এই পাহাড়ীরাও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব এদের জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি না দিয়ে সবাইকে বাঙালী বানিয়ে দিলেন। এইটাই সমস্যার মূল সূত্রপাত। আমরা যারা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল করেছিলাম, ১৯৭২ সালে আমরা তাদেরকে তো পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েইছিলাম। এবং আমাদের ঘোষণাপত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছিলাম। আমরা এখনো মনে করি এই চুক্তি টুক্তিতে কোন কাজ হবে না। এই চুক্তি বাস্তবায়ন হবে না। যেখানে গোষ্ঠী স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থের উপরে যে সরকারগুলো আসছেন তাদের মাধ্যমে তাই পাহাড়ীদের স্বশাসন কায়েম হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর হবে এ আশা অন্ততঃ আমরা করি না। আমরা মনে করি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মনে করে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে ৮টি প্রদেশ গঠন করতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বশাসিত প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যার মধ্য দিয়েই পাহাড়ীদের অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রক্ষিত হবে। আমি উনাদের এই সংগ্রামের সাথে আপনাদের সংগ্রামের সাথে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৭২ সাল থেকে আছে, আজও আছে, আগামীতেও আপনাদের সংগ্রামের পাশে থাকার অঙ্গীকার করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। পাহাড়ী জনতার জয় হোক।

# পার্বত্য শান্তি চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধু পাহাড়ে নয়, এদেশে সামগ্রিকভাবে শান্তি ফিরে আসবে

অধ্যাপক নিম চন্দ্র ভৌমিক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ

আজকের আলোচনা সভার মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, সুধীমন্ডলী প্রথমেই আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকের যে আলোচ্য বিষয় আপনারা সবাই জানেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচনা সভার শুরুতে মুখ্য আলোচক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঐ এলাকার অবিসংবাদিত নেতা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তার বক্তব্যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং এর পরেও আরও বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দ আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধাভাজন নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তাঁর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামের যে ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং কি প্রেক্ষাপটে শান্তি চুক্তি হয়েছে তাও বর্ণনা করেছেন এবং বিরাজমান পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। আমরা জানি যে শান্তি চুক্তি হওয়ার পরে একটি গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করেছিল এবং বাতিলেরও আহবান জানিয়েছিল। কিন্তু আমরা এও জানি এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আদিবাসী নির্বিশেষে সবাই চুক্তি সমর্থন করেছিল। বিশ্বেও এই চুক্তি প্রশংসিত হয়েছে।

আমরা মনে করি এই চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হওয়া উচিত এবং বাস্তবায়ন শুধু ঐ এলাকার স্বার্থে নয়, দেশের স্বার্থে অপরিহার্য- যেটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের যে ইতিহাস, বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আদিবাসী নির্বিশেষে সবাই সমর্থন করেছে, অংশগ্রহণ করেছে এবং পাহাড়ীরা সমর্থন জানিয়েছিল এটা আপনারা শুনেছেন এবং আমরা জানি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, অন্যান্য এলাকার যারা আদিবাসী তারাও শুধু সমর্থন করেননি বা অংশগ্রহণ করেননি, কোম্পানী কম্যান্ডার, প্লাটুন কম্যান্ডার হিসেবেও সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং ৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল যেটা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান যদিও ঐ সংবিধানে অপূর্ণতা ছিল যে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধান হবে, কি প্রেক্ষাপটে পরবর্তীকালে জনসংহতি সমিতিকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়েছিল তাও আমরা জানি এবং শান্তি চুক্তি হওয়ার মাধ্যমে আমরা আশা করেছিলাম সমস্যার সমাধান হবে।

আমরা মনে করি জনস্বার্থে এই চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়া উচিত এবং যত তাড়াতাড়ি করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ নেবেন। বিশেষ করে মুখ্য আলোচক যে বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করেছেন- যে ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের হাতে হস্তান্তর করা উচিত এবং বিধি প্রণয়ন করা উচিত, সেটি এখনও করা হয়নি এবং শরণার্থীদের যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়নি। যে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প তুলে নেয়া উচিত সেটাও হয়নি এবং একইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার

স্বীকৃত হয়েছিল শান্তি চুক্তির মাধ্যমে, এর যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। আমরা জানি শুধু বিগত কয়েক বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশে যেটা আমরা আশা করিনি যে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে বা ধর্মীয় বৈষম্য সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু করা হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করা হয়েছে। একটা বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং পাহাড়ীদেরকেও নানাভাবে নিপীড়ন, নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এখনও কোন কোন জায়গায় অব্যাহত রয়েছে। আপনারা শুনেছেন যে, কিভাবে এদেশের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করেছে। তবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাস থেকে জানি যদি সবাইকে সম্পৃক্ত করে দেশ পরিচালনা করা না হয় তাহলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এমনকি আমাদের কাছের রাষ্ট্র শ্রীলংকা সেখানে তামিল সমস্যা একটা রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছিল যথাযথ সময়ে সমস্যার সমাধান হয়নি বলে। সেখানে সরকার, রাজনৈতিক দলও বলছে যে- স্বাধীনতা ছাড়া বাকী সবকিছু তারা মেনে নেবে। এই পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেখানকার রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ জানাই যে তারা আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং বাস্তববাদী হওয়ার কারণে সেখানে সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

অনেকে ভারতের কথাও তুলে ধরেন। আমরা ভারতের কথা যতটুকু জানি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড বা অন্যান্য রাজ্য তারা কতটুকু স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে; পশ্চিম বাংলা, উত্তর প্রদেশ বা বিহার কতটুকু স্বায়ত্বশাসন ভোগ করে। কিন্তু এরপরও সেখানে সমস্যা রয়েছে। আর এখানে পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয়েছে সেই শান্তি চুক্তি যদি আমরা তুলনা করি ভারতের সেই উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে তবে ততটুকু স্বায়ত্বশাসন কিন্তু পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে দেয়া হয়নি। কিন্তু এরপরও শান্তি চুক্তি হয়েছে এবং জনসংহতি সমিতি মেনে নিয়েছে, বাস্তববাদী একটা মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে, সমঝোতা করেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল জনগোষ্ঠী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আদিবাসী সবাই দেশের ঐক্য, সংহতি চায় এবং মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু এটার পরও একটা বিভেদকামী শক্তি রয়েছে যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। এদের মোকাবিলা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।

আমাদের একজন বক্তা বলেছেন যে, নির্যাতন শুধু পাহাড়ীদের উপর হয় না, সকল জনগোষ্ঠীকে করা হচ্ছে এটা সত্য। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্য যে নারীদের উপরে বা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান আদিবাসীদের উপর সবচেয়ে বেশী নির্যাতন হয় তুলনামুলকভাবে বেশী এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে করে যে প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারিত্ব সেটা বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান আদিবাসীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারিত্ব নাই- সেটা মন্ত্রী পরিষদে হোক, পার্লামেন্টে হোক বা জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে হোক। উল্লেখ করা হয়েছে যে, পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী একজন মন্ত্রী দায়িত্বে থাকার কথা পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে। সেখানে একজন উপমন্ত্রীর কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আমরা আশা করবো যে এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হবে। এ ব্যাপারে এখানে যারা বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন এবং আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সফলকাম হবো। আমরা সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারবো। কোন বৈষম্য থাকবে না এবং আবার ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক সংবিধান পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হবে; ভূমি সমস্যার সমাধান হবে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুধু পাহাড়ী অঞ্চলে নয় এদেশে সামগ্রিকভাবে একটা শান্তি ফিরে আসবে, দেশে উন্নয়ন এবং অগ্রগতি হবে এই বলে আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

# যে চুক্তি সই হয়েছে সেই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা কারোর নেই

**বজলুর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ**

মাননীয় সভাপতি, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধা যিনি তার জনগণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছেন, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি শান্তি চুক্তির ৫ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং সংহতি জানানোর জন্য। আমরা এ কথা বলতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে আমরা যারা আছি তারাও তাদের সংগ্রামের সহযোদ্ধা এবং সমর্থক। আমি বিশেষভাবে **থ্রি চিয়ার্স** জানাতে চাই সন্তু লারমাকে- তিনি অনেক সাহস করে অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তির অপর পক্ষ আপনারা সবাই জানেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিনিও অনেক ঝুঁকি নিয়ে, অনেক সাহস ও প্রজ্ঞার সঙ্গে এই চুক্তিতে সই করেছিলেন।

আমি মনে করি তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথম যে উদ্যোগ ছিল তার গতিটা যেন শেষ দিকে শ্লথ হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে সাড়ে চার বৎসরে আরো অনেক দূর এগোনো সম্ভব ছিল। তবে একথাও আমি আমাদের পাহাড়ী ভাইদের বোঝার জন্য অনুরোধ করবো সেটা হচ্ছে যে এখানে নানা রাজনৈতিক শক্তি এবং অন্যান্য শক্তি চুক্তির বিরুদ্ধে সব সময় সক্রিয়। আপনারা দেখেছেন আজকে যারা ক্ষমতাসীন সেই বিএনপি-জামাতী জোট তারা এই চুক্তির বিরুদ্ধে গণমিছিল নিয়ে বহুদুর পর্যন্ত গিয়েছিল। চুক্তি বাতিলের দাবীতে তারা ছিল সোচ্চার। আজকে তারা ক্ষমতায় এসেও এই চুক্তি সম্পর্কে নিশ্চুপ; চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন উদ্যোগ নেননি।

আমি দ্বিতীয় অভিনন্দন জানাতে চাই এ কারণে যে, ৫ বৎসরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অনেক হতাশা সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ ধৈর্য হারাননি। তারা এখনও দাবী করছেন এই চুক্তিকে বাস্তবায়িত করার জন্য। এই চুক্তি থেকে তারা সরে যাননি। আমি মনে করি বাংলাদেশে যারাই সরকারে থাকেন না কেন তাদেরকে এই বিষয়টা বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।

তৃতীয় যে বিশেষ কারণে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই সেটা হচ্ছে এই প্রথম তারা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর সমস্যাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে এই ঢাকায় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তাদের যে সংগ্রাম সে সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে বাঙালী জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন দরকার। বাঙালী জনসাধারণ অনেকেই বিভ্রান্ত, এখনো বিভ্রান্তি আছে, তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে হবে। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে

এখানে বাঙালীদের মধ্যে পাহাড়ী ভাইদের সম্পর্কে অনেক সহানুভূতি আছে। সহানুভূতির বিরাট একটা উৎস এখানে রয়ে গেছে। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। তারা খাগড়াছড়ি কিংবা রাঙ্গামাটি থেকে ঢাকায় এসে আজকে এই সভার আয়োজন করেছেন, ঐখানেও হচ্ছে। আমি মনে করি এটা একটা সঠিক পদক্ষেপ এবং আমি এই কথা বিশ্বাস করি যে, যতো তারা বাঙালীদের মধ্যে তাদের প্রচার কার্যক্রম প্রসারিত করবেন ততোই আন্দোলনের পক্ষে জনমত আরও শক্তিশালী হবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা রাখি, যে চুক্তি সই হয়েছে সেই চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা কারোর নেই। আমি আশা করি, বাস্তবতা মেনে নিয়ে বর্তমান সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্যোগ নেবেন এবং পাহাড়ী জনসাধারণের জীবনে যে সমস্যা আছে সে সমস্যা সমাধানে তাদের যে সাংবিধানিক দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি আবারও এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং পাহাড়ী ও বাঙালী জনসাধারণের যে সংগ্রাম গণতন্ত্রের জন্যে, মানুষের অধিকারের জন্য, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সবচাইতে বড় কথা মানুষের যে মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজকে পাহাড়ী এবং বাঙালীদেরকে একাত্ম হয়ে সংগ্রাম করতে হবে। সেই সংগ্রামের জন্যে সেই সংগ্রামের পক্ষে, সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

# পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করার মধ্য দিয়ে সরকার আরেকটা ঐতিহাসিক ভুলের পথে পা বাড়াচ্ছেন

**মেসবাহ কামাল**
**সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ**
**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

সম্মানিত সভাপতি, পার্বত্য নেতৃবৃন্দ, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবীগণ এবং সুধীজন। আমি একজন গবেষক এবং একজন গবেষক হিসেবে আপনাদেরকে একটি তথ্য জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন নির্যাতন চলছে, বিভিন্ন বাহিনী সেখানে যখন অংশ নিচ্ছেন, সে সময় ১৯৮৫ সালে চীনের তখনকার সেনাবাহিনীর যিনি সিডিএস ছিলেন তিনি এসেছিলেন এবং তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সিডিএস বুড়িগঙ্গায় এক নৌ বিহার চলাকালীন সময়ে একটা দীর্ঘ ব্রিফিং দিয়েছিলেন। ঢাকা থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত গোটা পথটায় তাকে ম্যাপ ট্যাপ সবকিছু সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর ব্রিফিং দেয়া হয়। ফেরার পথে চীনের সেনাবাহিনীর সেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যিনি পরবর্তীকালে চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি শুধু একটিই কমেন্ট করেছিলেন, সেটা হচ্ছে- 'You have unnecessarily militarised a political problem. একটা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিনা কারণে আপনারা সামরিকায়ন করেছেন।'

আমি মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা এবং বাংলাদেশের আদিবাসী মানুষের যে সমস্যা তার মূলে হচ্ছে আসলে এটা। এ হলো রাজনৈতিক সমস্যা। রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা দরকার। তা না করে আমাদের শাসকরা একের পর এক সেই শাসকের নাম যাই হোক, যে দলই হোক অত্যন্ত অবিবেচকের মতো একের পর এক সামরিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছেন এবং এটা করতে যেয়ে সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করেছেন। কিন্তু আমি মনে করি তারপরে একটা আলোচনার প্রক্রিয়া, যে আলোচনার পথে বিএনপি ছিল, পরে অনিবার্যভাবে যখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন তখন যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই চুক্তি একটা ঐতিহাসিক চুক্তি। এই চুক্তি আমাদের গোটা দেশের সামনে একটা ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে রাজনৈতিকভাবে এই সমস্যাকে সমাধানের এবং জাতিগত যে সমস্যা আমাদের দেশের মধ্যে সে সমস্যার নিষ্পত্তির। এই ঐতিহাসিক সুযোগকে আমাদের গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়ন না করার মধ্য দিয়ে বিগত সরকার এবং বর্তমান সরকার আরেকটা ঐতিহাসিক ভুলের পথে পা বাড়াচ্ছেন এবং সে পথে চলেছেন এখনো। আমি মনে করি এ ঐতিহাসিক সুযোগকে গ্রহণ করা দরকার এবং এই চুক্তিকে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করা দরকার। এ চুক্তির মধ্যেকার অনেকগুলো দিক আছে যেগুলো শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আমি কয়েকটা দিক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের নয় বাংলাদেশের ব্যাপারে তার সমস্ত মতের সাথে আমি একমত। আমি তার সাথে দুয়েকটা বিষয়কে আরও বেশী গুরুত্ব দিয়ে আমি যা ফিল করি সেটা বলতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কেন, সমস্ত আদিবাসীদের সমস্যার মূল হচ্ছে ভূমি। ভূমিই হচ্ছে তাদের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি। কাজেই ভূমি থেকে উচ্ছেদের যে প্রক্রিয়া সেটাকে অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার এবং সেজন্য ভূমি কমিশন অনতিবিলম্বে কার্যকর করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের যে সেনাবাহিনী আছে সেখানে ৬টি ক্যান্টনমেন্ট থাকবে, সেটা স্বীকৃত। এর বাইরে যে সেনা ক্যাম্পগুলো আছে সেগুলো অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘকাল আমাদের দেশের সেনাবাহিনী বাঙালীর সেনাবাহিনী হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু এই সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের সেনাবাহিনী হিসেবে ভূমিকা রাখা দরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন সাম্প্রদায়িক দামামা বাজানোর চেষ্টা হচ্ছে- জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। আমি মনে করি সেখানে যে ক্যান্টনমেন্ট থাকবে, সেখানে যে সিভিল পুলিশ ফোর্স থাকবে তাদের উচিত হচ্ছে যে সেখানে বাঙালীর নয় বাংলাদেশের বাহিনী হয়ে তাদের যে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পালনের দায়িত্ব, তার পাশাপাশি তারা সমস্ত জাতির মানুষের, সমস্ত ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবেন। কাজেই সেদিক থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের বাহিনী হিসেবে তাদের ভূমিকাটাকে স্পষ্ট করে তোলার দরকার আছে। আর আঞ্চলিক পরিষদকে, জেলা পরিষদকে ক্ষমতায়ন করা খুব জরুরী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে যে উন্নয়ন কর্মকান্ড তার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদের। কিন্তু আঞ্চলিক পরিষদকে সেই দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৯ সালে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে নির্ধারিত হয়েছিল যে - জেলা পরিষদের, তখনকার সময়ের স্থানীয় সরকার পরিষদ তার হাতে ২২টা বিষয় হস্তান্তরিত হবে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে চুক্তির মধ্যদিয়ে এটাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে আরও ১১টি বিষয় মোট ৩৩টি বিষয় হস্তান্তর করা হবে জেলা পরিষদের হাতে। সেগুলো আজ পর্যন্ত করা হয়নি। ১টা জেলায় করা হয়েছে ৫টা, ২টা জেলায় করা হয়েছে ৪টা বিষয় হস্তান্তর। বাকীগুলো হস্তান্ত র করা হয়নি। অনতিবিলম্বে এগুলোকে হস্তান্তর করে এই সমস্ত decentralisation টাকে effective করতে হবে। আসলে দরকার হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডটাকে আঞ্চলিক পরিষদের অধীনে নিয়ে এসে সেখানকার যে আঞ্চলিক ক্ষমতায়ন সেই ক্ষমতায়নটা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশের সকল আদিবাসীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল আদিবাসীর মুক্তি সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমি সম্প্রতি একটি গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয় যে এনজিওগুলো ক্ষুদ্র ঋণ দেয়, তার শতকরা ৮০ ভাগ যাচ্ছে বাঙালী সেটেলারদের কাছে এবং তা পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন সমস্যা তৈরী করছে। আমি এ কথা বলি না যে এনজিওরা সেখানকার বাঙালীদের সহায়তা করবে না। কিন্তু সেখানে যেহেতু এই চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যে মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল-এই বাস্তবতা স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই সেখানে প্রধান সহায়তাটা সেখানকার আদিবাসীদের কাছে যাওয়া উচিত এবং সেখানে এমন কোন ভূমিকা কারোর নেয়া উচিত না যেটা সমস্যাকে আরও জটিল করে। এই দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা দরকার।

আমি শেষ কথা বলবো পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের, এদেশের আদিবাসীদের, এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং সকল সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষের যে লড়াই, সমমর্যাদার লড়াই, গণতান্ত্রিক অধিকারের যে লড়াই, এ লড়াই দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তির পরের ৫ বছর প্রমাণ করেছে যে এ লড়াই হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। এ লড়াই করতে হবে এবং এ লড়াইয়ে আপনাদের পাশে আমরা থাকবো এই প্রত্যাশা এবং এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

# যেহেতু এটা সরকারী চুক্তি, সেহেতু বিগত সরকারের অসমাপ্ত কর্মকান্ড পরবর্তী সরকার সমাপ্ত করবেন

**প্রমোদ মানকিন এম পি**
**সভাপতি, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন**
**বৃহত্তর ময়মনসিংহ**

পার্বত্য শান্তি চুক্তির ৫ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে আজকের আলোচনা সভায় সম্মানিত সভাপতি, এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তিত্ব আমাদের সারা বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য বিখ্যাত আদিবাসী নেতা শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের আলোচনা সভায় জাতীয় নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী, বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আদিবাসী ভাই ও বোনেরা, আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমার অঞ্চল বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, সুনামগঞ্জ। ঐ এলাকায় প্রায় আড়াই লক্ষ গারো, হাজং, কোচ, ঢালু ও বানাই প্রভৃতি আদিবাসী জনগণের পক্ষ থেকে আজকের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তির কারণে এই দিনটিকে স্মরণ করে আমি শুভেচ্ছা জানাই আমার পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী ভাই বোনদের। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সারা বাংলাদেশে আমরা যারা আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছি আমাদের কাছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি আশার বস্তুও ছিল। দীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করতে পেরেছিলেন। অনেক অশান্তির পরে শান্তি চুক্তি হয়েছিল এবং ১৯৯৭ সালে যে দলের সরকার অধিষ্ঠিত ছিল সেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর একজন সদস্য হিসেবে আমি বলতে চাই সে সময়কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

দেশের সমস্ত মানুষ, পৃথিবীর মানুষ যারা মানবতার অধিকারের জন্য হৃদয় রাখে, প্রাণ রাখে সকলেই সেদিন এই শান্তি চুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জনতা এই শান্তি চুক্তিকে প্রাণভরে গ্রহণ করেছিল, অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারপরেও কথা ছিল এবং আমরা দেখেছি শান্তি চুক্তি সেদিনও কিছু লোক বিরোধিতা করেছে, শান্তি চুক্তি হতে দেবে না এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। শান্তি চুক্তি হলে ঐ অংশটুকু ভারতের হয়ে যাবে এ ধরনের অপপ্রচারও ছিল। তারপরে কিন্তু শান্তি চুক্তি হয়েছিল এবং শান্তি চুক্তির সুবাতাস এই দেশে বয়েছে। শান্তি চুক্তির ১০০% বাস্ত বায়ন হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে হয় নাই আমাদের নেতা সেটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সে শান্তি চুক্তির সকল দফা যেন বাস্তবায়িত হয় সে জন্যই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তিতে আলোচনা করেছেন। জাতীয় পর্যায়ে এটাকে আলোচনার জন্য এনেছেন যাতে করে দেশের সকল আপামর মানুষ সেটাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং সমর্থন দিতে পারে। আমিও এটি পালনের জন্য এইবারে প্রথম দাওয়াত পেলাম। আমরা চাই যে আমাদের আদিবাসীদের সমস্যা জাতীয়ভাবে প্রতিফলিত করে দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের সমর্থন নিয়ে আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান আদায় করতে। কোন কোন ক্ষেত্রে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন হয় নাই এই পার্বত্য

চট্টগ্রামের বাইরে আমরা যারা দেশের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় আছি আমরাও জোর দাবী জানাই- যেহেতু এটি সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে লিখিত চুক্তি হয়েছে সেহেতু এই চুক্তির প্রতিটি দফা যেন বাস্তবায়িত হয়।

সুধীমন্ডলী, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চয়ই সমস্ত কিছু না হলেও তারা কিঞ্চিত উন্নয়নের পথে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েছেন। এখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন যে সারা বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় বঞ্চিত, অনগ্রসর এবং আমরা এখনো পিছনে পড়া সম্প্রদায় হিসেবে রয়েছি। প্রতি বছর এবং সার্বক্ষণিকভাবে আদিবাসী সম্প্রদায় এদেশের মানুষের কাছে, এদেশের সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছে যাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায় আছে, তাদেরও যেন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় বলছেন, বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় বর্তমানে যে সকল সরকার আসছে তাদের করুণার পাত্র হিসেবে জীবন যাপন করছে। সংবিধানে আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি অক্ষরও লেখা নাই তাদের জীবন, তাদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য। সুতরাং আদিবাসী সম্প্রদায় আজকে দাবী করে যাতে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়, এটাই আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের আদিবাসীদের চাওয়া।

সুধীমন্ডলী, আমি শুধু বলতে চাই যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই এবং শান্তি চুক্তির যে সকল ধারা বাস্তবায়িত হয় নাই সেগুলো যাতে বাস্তবায়িত হয় সেটাই দাবী করি। এই চুক্তি সরকারী চুক্তি ছিল। যেহেতু সরকারের চুক্তি সেহেতু এখনকার সরকার এবং আগামী দিনের কোন সরকার বাতিল করতে পারবে না এবং করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। এই সরকার, বর্তমান জোট সরকার, আমরা জানি যখন এ চুক্তি সম্পাদিত হয় তারা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিল এবং এই কথা বলা হয়েছিল যে তারা সরকারে আসলে, সরকার গঠন করতে পারলে এই শান্তি চুক্তি বাতিল করা হবে। বাতিল যেহেতু করেন নাই, বাতিল যেহেতু করতে পারবেন না যেহেতু সরকারের চুক্তি, সেহেতু বিগত সরকারের অসমাপ্ত কর্মকান্ড পরবর্তী সরকার সমাপ্ত করবেন এটাই রেওয়াজ, বিশ্বব্যাপী রেওয়াজ। সুতরাং বর্তমান সরকারের কাছে আদিবাসীদের দাবী যে, শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত হোক। দেশের অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায় যারা অনগ্রসর, পশ্চাদপদ রয়েছে তাদেরও যেন সাংবিধানিকভাবে আইন করে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই দাবী জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

# সকলেই মিলে আওয়াজ তুলতে চাই- এই চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব যেন বর্তমান সরকার সঠিকভাবে নেন

**খুশী কবির**
**নির্বাহী পরিচালক, নিজেরা করি**

আজকের এই সভার সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত এবং সামনের সুধীবৃন্দ, শান্তি চুক্তির পর ৫ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে সেটাতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি শুরু করতে চাই প্রথমে স্মরণ করে কল্পনা চাকমাসহ সকল নারী ও পুরুষ যারা তাদের নিজেদের অধিকার স্থাপন করার জন্য প্রাণ দিয়েছে এবং আজকে এই স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্থাপন করার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তার সাথে আমার আগের বক্তারা যারা বলে গেছেন আলফ্রেড সরেনের হত্যার বিচার এখনো হয়নি, সেটারও দাবী জানাচ্ছি এবং কল্পনা চাকমার যে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি আমাদের কারোর কাছে সেটা প্রকাশেরও দাবী জানাচ্ছি।

আমার মনে হয় আজকের যে বিষয়টা আলোচনা করছি এটা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে না, পুরোপুরি এটার একটা প্রতিফলন দেশের গোটা জাতির এবং দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় এর একটা গুরুত্ব আছে এবং এটার সাথে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির বিষয়টা সম্পর্কিত। আদিবাসীদের নিয়ে আমার পূর্বের অনেক বক্তা অনেক কিছু বলেছেন। আমাদের ঐতিহাসিক যতগুলো আন্দোলন আর সংগ্রাম হয়েছে তাতে আদিবাসীদের যে ভূমিকা, টংকা আন্দোলন থেকে নাচোলের আন্দোলন সবকিছু কেন্দ্র করে আদিবাসীদের একটা বিশাল ভূমিকা আমরা ভুলে যেতে পারি না এবং এটা স্মরণ করা, স্বীকৃতি দেয়া, আমাদের ইতিহাসের অংশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা এবং মনে রাখা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটি দেশে শুধু একটি চিন্তা, একটি ধর্ম, একটি সংস্কৃতি যদি থাকে সে দেশটা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে। বহু চিন্তা, বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষা, বহু পদ্ধতি কালচার এর ডাইভারসিটি যতটুকু একটা দেশের মধ্যে থাকবে, একটা রাষ্ট্রের মধ্যে থাকবে, সে রাষ্ট্র এবং সে দেশ আরও বেশী সমৃদ্ধ হবে সেটা আমি বিশ্বাস করি।

শান্তি চুক্তির একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল যে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের যে সকল দায়িত্ব কর্তব্য দেয়া হয়েছিল যাকে আমরা স্থানীয় সরকার বলে বার বার বলেছি। এই স্থানীয় সরকার শাসন ব্যবস্থা জনগণের হাতে যাবে এটাই আমরা মনে করেছিলাম। ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি, যেটা সারা বিশ্বে নাড়া দিয়েছে, আমি মনে করি এটা যদি সাথে সাথে একটা কাঠামো এবং এটার বাস্তবায়নের বিষয়টা স্থাপন হয়ে যেতো, একটা সিস্টেম বা একটা পদ্ধতি যদি চালু হয়ে যেতো তাহলে আজকে বা কালকে যে কোন সরকার আসুক না কেন এটা দীর্ঘায়িত করা বা পিছিয়ে দেয়া বা বাস্তবায়ন না করার সমস্যাটা হতো না। যদি চুক্তির সাথে সাথে এই আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, ভূমি কমিশন এবং সব কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যেতো, প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতো, এটা যদি সঠিকভাবে

in place থাকতো, জায়গা মতো যদি এর অবস্থানটা থাকতো তাহলে কিন্তু আজকে এই অবস্থাটা আমরা এখানে বসে যে ধরনের বক্তব্য রাখছি সেটা হয়তো আমরা আরও জোরে, আরও শক্তভাবে, আরও শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আরও ভূমিকা পালন করতে পারতাম। আমরা আজকে বসে বলছি যেটা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছি ৫ বছর পরেও এখনও সেটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শুধু চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ সরকারের এ বিষয়ে সমালোচনাটা গ্রহণ করা উচিত যে এই সাড়ে তিন বছরে তাদের এই ব্যর্থতা ছিল এবং বর্তমান সরকারকে আমার মনে হয় আমাদের সকলের এ দেশের নাগরিক হিসেবে চাপ দেওয়া উচিত যে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব এবং আমরা সকলেই মিলে আওয়াজ তুলতে চাই যে এই বাস্তবায়নের দায়িত্ব তারা যেন সঠিকভাবে নেয়, যেভাবে তারা শুরু করে। এখানে ইচ্ছেমত যেন এই বাস্ত

**চুক্তি অনুযায়ী সকল বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কাজ করার কথা ছিল আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতিসহ এবং তাদের আওতায়। আমি জানি না, এখানে সন্তুদা স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন যে, প্রত্যেকটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যে সেখানে কাজ করছে তারা আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে কি-না; আপনাদের নির্দেশে এবং আপনাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে কিনা? আমি এই কারণে বিষয়টা আনতে চাচ্ছি, আমাদের সমতল বাঙালীদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং এখানে কি করা উচিত এবং ভূমিহীনদের সমস্যাগুলো আমরা স্পষ্টভাবে বুঝি। কিন্তু আদিবাসীদের বিষয়টা ভিন্ন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টা ভিন্ন, সেখানে আমরা যেন সমস্যার সৃষ্টি না করি।**

মেসবাহ কামাল ভূমি বিষয় আলোচনা করতে হয় আমি খালি একটাই চাচ্ছি বা একটা লাইন যোগ পর্যন্ত ভূমি বিষয়টার কোন যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ভূমি শুধু ব্যক্তি মালিকানার সকল আদিবাসীদের জন্য তাদের যে ব্যবস্থাপনা ছিল, একটা মালিকানা ছিল, এই পার্বত্য চট্টগ্রামে না পার্বত্য আদিবাসীদের বিষয়ে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে যেহেতু ব্যক্তি অনেক সামাজিক ভূমি যেটা আদিবাসী গোষ্ঠী ব্যবহার উৎপাদনের জন্য- সব বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিতরণ করেছে। সেটা করেছে, জমি হারা করেছে এবং সমস্যায় আরও বেশী ফেলেছে এবং দারিদ্র আরও বেড়ে গেছে। ভূমি বিষয়টা খুব সুচিন্তিতভাবে আনা দরকার।

চুক্তিটা হয়েছে সেভাবেই এককভাবে তার নিজের বায়নের বিষয়টা না আসে।

নিয়ে এসেছেন যেটা আমি চেয়েছিলাম। আমার মনে ব্যাখ্যা বা বক্তব্য রাখতে করতে চাচ্ছি যে, যতক্ষণ না উত্তর সঠিকভাবে না আনা বিষয়টা জটিল হয়ে থাকবে। বিষয় না, আমরা চাচ্ছি সংস্কৃতিগতভাবে যৌথভাবে জুম চাষের বিষয়ে সামাজিক বিষয়টা আমাদেরকে শুধু চট্টগ্রামসহ সকল আসা উচিত। সবচেয়ে বড় মালিকানা ছিল না সেহেতু সামাজিকভাবে বিভিন্ন করতো তাদের নিজের বেদখল হয়েছে এবং সরকার ব্যক্তিদের মাধ্যমে এটা মানুষকে আরো বাস্তুহারা

Classified state forest এবং Unclassified state forest, এই যে পার্থক্য আছে সেখানে আমার মনে হয় Unclassified state forest হচ্ছে আদিবাসীদের জায়গা-জমি এবং এটাকে আমাদের গ্রহণ করা দরকার এবং সেভাবে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা দরকার যেটা আদৌ বর্তমানে হচ্ছে না। আমরা জানি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল তাদের অধিকারের জন্য এবং সাহস নিয়ে তারা চুক্তিটা স্বাক্ষর করেছে। আমি শেষে একটা বিষয় যেটা আনতে চাচ্ছি সেটা হলো যে- নারীদের বিষয়টি কিন্তু চুক্তিতে খুব বেশী আসেনি, শুধুমাত্র যে রিজিওনাল কাউন্সিল সে রিজিওনাল কাউন্সিলে যে তিনজন নারী সদস্যা রাখা আছে তার বাইরে কিন্তু নারীদের বিষয়টা স্পষ্টভাবে আসেনি। যদিও আমরা জানি যে সকল ধরনের আদিবাসী বিশেষ করে পাহাড়ীদের মধ্যে নারীদের অর্থনৈতিক

এবং সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আপনারা যখন কর্মসুচী নেন তখন বাস্তবায়ন অবশ্যই করবেন।

শেষে একটা বিষয় বলতে চাই যে, আমি একটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সাথে বহু বছর ধরে কাজ করছি। চুক্তি অনুযায়ী সকল বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কাজ করার কথা ছিল আঞ্চলিক পরিষদের সম্মতিসহ এবং তাদের আওতায়। আমি জানি না, এখানে সন্তুদা স্পষ্টভাবে বলতে পারবেন যে, প্রত্যেকটা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা যে সেখানে কাজ করছে তারা আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, আঞ্চলিক পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে কি-না; আপনাদের নির্দেশে এবং আপনাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে কিনা? আমি এই কারণে বিষয়টা আনতে চাচ্ছি, আমাদের সমতল বাঙালীদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং এখানে কি করা উচিত এবং ভূমিহীনদের সমস্যাগুলো আমরা স্পষ্টভাবে বুঝি। কিন্তু আদিবাসীদের বিষয়টা ভিন্ন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টা ভিন্ন, সেখানে আমরা যেন সমস্যার সৃষ্টি না করি। আপনাদের যে শান্তি চুক্তি, আপনাদের অধিকার, গোটা বাংলাদেশের আদিবাসীদের অধিকার স্থাপন করার জন্য যে কর্মসুচী, কর্ম পরিকল্পনা এবং দাবী তুলছেন তার সাথে সম্পূর্ণ একমত এবং আপনাদের সাথে আমি আমার একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং আপনাদের পাশে থাকবো। আমার সাথে যারা আছেন সবাই আপনাদের সাথে থাকবেন।

# শান্তি চুক্তির অবশিষ্ট ধারাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। আমরা বিরোধী দলে থাকলেও শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ

**আব্দুল জলিল**
**প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী, আমার ভাই ও বোনেরা, আসলামাই আলাইকুম। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আমাদের সবার জানা আছে। আমি সেই লক্ষ্যে বা সেই দিকে বিস্তারিত কোন আলোচনায় যেতে চাই না। সামান্য দু'একটি কথা প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে উপস্থাপন করতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ১৯০০ সালে বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ চালুর পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ মর্যাদা বার বার ক্ষুন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথম এই সমস্যার সৃষ্টি করে। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টি এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীদের উৎখাতের ভিতর দিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হয়। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতির পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জীবনধারা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত হানে। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বঞ্চনা ও ক্ষোভ নিরসন এবং ঐ অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন এবং ১৯৭৫ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু রাঙ্গামাটি শহরে গিয়ে পার্বত্য জনগোষ্ঠীল স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে জাতীয় সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করেন।

জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বড় ভাইসহ বিশিষ্ট উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে জাতীয় মূল স্রোতে সামিল হন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠে। একদিকে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক স্বৈরাচার যেমন পাকিস্তানী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক সমাধান চালাতে গিয়ে সমস্যাকে গভীর এবং ব্যাপক করে তুলে। অন্যদিকে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করে। ২০ বছরের অধিক সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, আহত হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ, মাতৃভূমি ছেড়ে ৬৫ হাজার উপজাতি জনগণ পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হন।

অতীতের সন্ত্রাসগুলো কেবল আভ্যন্তরীণ কারণেই নয়, পাকিস্তানের শাসকদের মদত যোগাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জিইয়ে রাখার কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ কথা সকলেরই জানা যে ৯৬ পূর্ববর্তী সরকারগুলো পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি। আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৮২ সালে দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা

করেছিলাম যে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে এবং আমরা এই সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে ১৯৮২ সালে দলীয়ভাবে গ্রহণ করেছিলাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন, শান্তি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে পার্টির নেতৃত্বকে অবহিত রাখার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৯৮৬ সালে একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সেল দলীয়ভাবে আমরা গঠন করেছিলাম। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনে জয়লাভের পর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ১৪ অক্টোবর ১১ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে এই সমস্যাটাকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাত্র ৮ দিন পরে ২১ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সরকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণের সরকার মাত্র এক বৎসরের চেষ্টায় জাতীয় কমিটি এবং জনসংহতি সমিতির ৭ম বৈঠকে চূড়ান্ত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি।

আমরা আওয়ামী লীগ, এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি? কি দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা এই সমাধানের পথে এগিয়ে গিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগ সমস্যাটিকে -

- প্রথমতঃ সংকীর্ণ দলীয় ও গোষ্ঠীগত দৃষ্টিতে না দেখে সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছে।
- দ্বিতীয়তঃ জাতিসংঘের সমতার প্রতি বিশ্বস্ত আহবানে, সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদের আলোকে একটি এথনিক মাইনরিটি বা অনগ্রসর সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাগুলোর ন্যায়সংগত আশা-আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা থেকেই বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় এই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আমরা প্রদান করেছি।
- তৃতীয়তঃ সমস্যাটিকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে দেখে তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ বা মধ্যস্থতা ছাড়াই সমাধানের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী আমরা ছিলাম।

আওয়ামী লীগ বিএনপি-র মত সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিকীকরণের ঘোরতর বিরোধী ছিল, সমস্যার গভীরতা, ব্যাপ্তি, জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনা করে তার সমাধানের জন্য তৎকালীন প্রধান বিরোধীদলসহ দেশের কল্যাণকামী সকল প্রকার গণতান্ত্রিক শক্তি, উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনসহ সকল সিভিল সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়েছি। আমি শান্তি চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে চাই না। এটা আপনাদের সবাইয়ের অবগতি আছে। এখানে একটি বিশেষ দিক আমরা উল্লেখ করতে চাই, তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই একটি দেশের এথনিক মাইনরিটি তথা সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বার সশস্ত্র যুদ্ধের অবসান ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান প্রায়ই বিরল ঘটনা। এর ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষভাবে পার্বত্য জনগণের ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। পরাজিত হয় হিংসা, বিদ্বেষ এবং জিঘাংসা। জয় হয় শুভ বুদ্ধির, ন্যায়, শান্তি ও মানবতার। বিলুপ্ত হয় অন্ধকার।

আপনারা জানেন, এই শান্তি চুক্তি করার পূর্ব মুহূর্তে এবং শান্তি চুক্তির পরেও যে ষড়যন্ত্র এ দেশে চলেছে সেই ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আমি সেদিকে যাবো না। এমনকি সে দিন আজকে যারা ক্ষমতাসীন আছেন- বিএনপি-জামায়াত জোট, তারা এই শান্তি চুক্তির

ফলে ঐ অঞ্চলকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও এদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে এবং এই শান্তি চুক্তি স্থাপনে প্রতি পদে পদে তারা বিরোধীতা করেছে এবং এদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করে এই শান্তি চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত না হয় সেই কার্যক্রমও তারা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর চুক্তি বাস্ত বায়নে আওয়ামী লীগ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কথা আমি উল্লেখ করতে চাই।

১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ মার্চের মধ্যে ৪ কিস্তিতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তরুণরা অস্ত্র ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ভারত থেকে ৬৫ হাজার চাকমা উদ্বাস্তু সসম্মানে মাতৃভূমিতে ফিরে আসা সম্পন্ন হয়। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৩রা মে থেকে ৬ মে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ৪টি বিল। পার্বত্য শান্তি চুক্তি লাভ করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। আওয়ামী লীগ শাসনামলে শান্তি চুক্তির প্রায় প্রতিটি ধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এখানে সমালোচনা হচ্ছে বা সমালোচনা হয়, আমরা সমালোচনার উর্ধ্বে নই। আমাদের যে সফলতা আছে সে সফলতাকে সকলের অবশ্যই স্বীকার করা উচিত এবং যে ব্যর্থতা যেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই সেইটুকু আমরা নিজেরা অনুধাবন করি যে, আমাদের সীমাবদ্ধতা কি ছিল এবং কি সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা আমাদের উদ্যোগকে বাস্তবে রূপায়ণ করতে পারি নাই। এখানে যদি বলা হয় যে আমরা যারা চুক্তি করেছি তারা এই চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছি, আজকে এই কথাও উল্লেখিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, এ রকম বক্তব্য দিয়ে শুধু সত্যের অপলাপ ছাড়া, বিভ্রান্ত করা ছাড়া, আওয়ামী লীগের প্রতি আক্রোশ এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করা ছাড়া আমার মনে হয় এ কথাগুলোর যুক্তি আমি এখানে অনুধাবন করতে পারি না। আমরা বলি নাই যে সকল কাজে সফলতা অর্জন করেছি। আমরা যেটুকু অর্জন করেছি সেই অর্জনটুকুকে বাস্তবে রূপায়ণ দেয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং সে চেষ্টায় যে বাঁধা-বিপত্তি তা আপনারা জানেন; রাজনীতির প্রতিপক্ষতা ছিল, আমলা চক্রের জটিলতা ছিল এবং বিভিন্নভাবে এই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রকে overcome করে আমরা আমাদের চূড়ান্ত জায়গায় পৌছতে পারিনি, এটা বাস্তবতা এবং সেই বাস্ত বতা আমরা স্বীকার করি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে আমাদের আজকে অনেকদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, ৫বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে এই বাস্তবতাকে, চুক্তির বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমরা অতীতের কোন কোন অবস্থানে কে কোথায় ছিলাম সেটা ভুলে গিয়ে এটা বাস্তবায়নের পথে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থে এবং এই দেশের কল্যাণের স্বার্থে।

আমি এই কথাটুকু বিনীতভাবে আজকে এখানে উপস্থাপন করতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয় এবং উপজাতীয় সাংসদ কল্প রঞ্জন চাকমা পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং সাবেক শান্তি বাহিনীর প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনঃগঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন একজন উপজাতীয় সংসদ সদস্য। চুক্তি অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় আঞ্চলিক ভূমি কমিশন গঠন করে, নিয়োগ দেয়া হয় ২জন সার্কেল চীফকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয় এবং স্বদেশে প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ এবং পুনর্বাসন কাজ শুরু করা হয়। অস্ত্র সংবরণকারী শান্তিবাহিনী সদস্যদের কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তাদের প্রতিটি পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। পার্বত্য অধিবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার উন্নয়নে গ্রহণ করা হয় বহুমুখী কর্মসুচী। তিন পার্বত্য জেলার সার্বিক উন্নয়নে জননেত্রী

শেখ হাসিনা সরকার প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং বিভিন্ন দেশের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে গ্রহণ করে বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্মসুচী।

সুধীমন্ডলী, আমি আমার বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করবো না। আমি বলতে চাই- Liberty is the one thing you cannot have unless you give it to others, অন্যকে মুক্তি না দিলে তোমার নিজের মুক্তি আসবে না। মনীষী উইলিয়াম এলেন হোয়াইটের এই উক্তি বাঙালী জাতি গভীরভাবে উপলব্ধি করে। অন্যের অধিকার হরণ করে আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করিনি। সংখ্যা যত কমই হোক, শক্তিতে যত তুচ্ছই হোক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং ডেমোক্রাটিক লিবার্টি অর্থাৎ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ভিতর দিয়েই বাঙালী জাতি এবং বাংলাদেশ তার বিজয় এবং মহান স্বাধীনতাকে বিশ্বের দরবারে নতুন মর্যাদায় মহীয়ান করে তুলেছে। শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই এথনিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বিরল এ সম্মানের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি গৌরবান্বিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ বিশ্বে এথনিক সমস্যা সমাধানে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির অবশিষ্ট ধারাগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। আমরা বিরোধী দলে থাকলেও শান্তি চুক্তির বিভিন্ন ধারা এবং উপধারার পূর্ণাঙ্গ বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার যেন অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, ভ্রাতৃঘাতী হানাহানির সৃষ্টি না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধৈর্য, সহযোগিতার মনোভাব এবং সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার আহবান জানাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঘিরে কেউ যেন পানি ঘোলা করতে না পারে, আমাদের এই সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভূখন্ডকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

## সংবিধানের সঙ্গে শান্তি চুক্তির কোন কিছু বিরোধাত্মক হয় তাহলে এই শান্তি চুক্তি বাতিল হবে না, দরকার হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে

**মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম**
**সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি**

সম্মানিত সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী নায়ক আমাদের সন্তু লারমা, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ এবং প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে এবং আলোচনা সভায় আমাকে আমন্ত্রন জানানোর জন্য এবং কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই সুযোগে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পার্বত্য এলাকার জুম্ম জনগণের প্রতি এবং দেশের আদিবাসী জনগণের প্রতি অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৫ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এই আলোচনা সভায় এই চুক্তি বাস্তবায়ন করার পথে যে অগণিত শহীদ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে; সংগ্রাম করে, লড়াই করে পুরানো বাস্তবতার প্রতিকূলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে অন্ততঃ এক-দু'টা কদম ঐতিহাসিক অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে সেই শহীদদের প্রতি স্মরণ এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নিশ্চয়ই আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, এই সংগ্রামের সূচনা অনেক আগে থেকে হলেও তার বিশেষ মাইলফলক হিসেবে আমরা ১৯৭১ সালকে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ ১৯৭১ সালে যে লড়াই হয়েছিল আমাদের এই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যখন পৃথিবীর কোন একটি ভূখন্ডে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য লড়াই হয়, সেই লড়াই সেই ভূখন্ডে প্রতিটি জাতিসত্ত্বার নিজস্ব অধিকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরা এবং স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জীবন, শাসন প্রণালী পরিচালনা করার অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে সেই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। তাই ৭১-এর সংগ্রাম কেবল বাঙালীর সংগ্রাম ছিল না, ৭১'র সংগ্রাম ছিল আমাদের এই ভূখন্ডের বাঙালীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিটি জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নিশ্চয়ই এই যুক্তির ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয় তার ভিতরে আমাদের সংগ্রামের মর্মবাণী প্রধান অংশটা স্থান পেলেও একটা অন্যায় হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের এই ভূখন্ডে বাঙালী জাতির অধিকারের স্বীকৃতি হলেও এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি তখন দেয়া হয়নি। এখানে কামালভাই (ড. কামাল হোসেন) উপস্থিত আছেন, যখন সংবিধানের খসড়া রচনা করা হয়, আমাদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টি, আমরা এটাকে এটা ঐতিহাসিক সংবিধান হিসেবে সমর্থন জানিয়েছিলাম এবং তিনটা কি চারটা পয়েন্টে আমাদের দ্বিমত ছিল, আপত্তি ছিল এবং মিছিল করে সেই দাবী উত্থাপন করেছিলাম। আর ভিতরে একটা আপত্তির জায়গা ছিল এইখানে যে, আমাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোর অধিকারের স্বীকৃতি সেই সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত ছিল না। যে কারণে আমাদের বঙ্গবন্ধু এই দেশের সমস্ত মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে বা প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়ে যার নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তিনি একসময় পরিস্থিতির গভীরতা ও জটিলতাকে উপলব্ধি না

করে বলেছিলেন 'তোমরা সবাই বাঙালী হয়ে যাও'। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু '৭৩ সালে এই বক্তৃতা দেয়ার পর এটাও ঠিক ১৯৭৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে রাঙামাটিতে বক্তৃতা করার সময় নিশ্চয়ই তিনি সেই ভুল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

সেই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে, এই দেশে সমস্ত সংগ্রামী জাতিসত্ত্বার অধিকার কিভাবে স্বীকৃতি দেয়া যায় সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করবো। আমাদের এই যে লড়াই, '৭১ সালের লড়াই এবং তার পরবর্তীকালে অধিকার বঞ্চিত হয়ে যে অবস্থাটা দাঁড়ালো সেখান থেকে অধিকারকে ছিনিয়ে আনার জন্য অনেককে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হয়েছে। সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো প্রয়োজন।

পাঁচ বছর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলো। যেদিন এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল আমাদের পক্ষ থেকে এদেশের বামপন্থীদের পক্ষ থেকে আমরা এই শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করেছিলাম এবং এটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হোক সেই কথা আমরা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে, এটা শর্তে নয় এটা প্রয়োজনীয় একটা পদক্ষেপ, যদিও এখানে শেষ হলো না। আমাদের দাবী আরও বাকী আছে এবং এই সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি যতদিন না আদায় হচ্ছে, তাদের স্বায়ত্বশাসনের পূর্ণ ব্যবস্থা না হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যের দিকে যাবার জন্যই এই শান্তি চুক্তি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমার মনে আছে তখন যে আলোচনাগুলো হতো; তখন কিছু কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে, এই শান্তি চুক্তি আমাদের বিদ্যমান সংবিধানের কতগুলো জায়গায় বিরোধাত্মক হয়েছে, সংবিধান বিরোধী চুক্তি করা হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে এবং আরও দু'একটি মহলের পক্ষ থেকে এই যুক্তিগুলো তুলে ধরা হয়েছে। আমরা বলেছিলাম এই শান্তি চুক্তি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি সংবিধানের সঙ্গে কোন কিছু বিরোধাত্মক হয় তাহলে এই শান্তি চুক্তি বাতিল হবে না, দরকার হলে সংবিধান সংশোধন করে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটা কেবলমাত্র বাংলাদেশের কিছু নাগরিকদের বা একটা এলাকার জন্য কতগুলো প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রদবদলের জায়গা থেকে চিন্তাগুলো আসেনি। এটা মৌলিক একটা রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি থেকে এসেছে এই কথাটা একটু আগে জলিল ভাই বলেছিলেন যে, যে জাতি লিবারেশন চায় অন্যকে পদানত রেখে সে জাতির কোনদিন লিবারেশন হতে পারে না। সুতরাং এই বাঙালী জাতি আমরা গৌরব করে দাঁড়াতে পারি তখন যখন আমরা বলতে পারি যে, আমরা বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলাম একটা রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে সেই দর্শন যদি কারেক্ট হয় এটা বাঙালীর জন্য কারেক্ট, চাকমার জন্য কারেক্ট, ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্য কারেক্ট, আমাদের আদিবাসী সকলের জন্য কারেক্ট। সুতরাং আমার নিজের ক্ষেত্রে খোলাখুলি প্রয়োগ করবো অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবো না- এটা কোনদিন বরদাস্ত হতে পারে না। তাই আজকে আলোচনা করার সময় আমার খুব খারাপ লাগে যখন আমি দেখি আমাদের কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত রাজনীতিবিদদের ভিতরেও এই প্রশ্নটা উত্থাপন করে যে, যখন আমি আদিবাসীদেরকে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে কিছু অধিকার দান করে দিলাম, আমি মহানুভব। ওদেরকে কি কি অধিকার আমি দিচ্ছি? আমি দেওয়ার কে? এই দেশ বাঙালীর যেমন, তেমনি এই দেশে পার্বত্য এলাকার জুম্ম জনগণেরও রয়েছে সমানাধিকার। আমাদের বাঙালীদের কতটা অধিকার দিলো এইটা আমাদের হিসাব করা প্রয়োজন। এই বোধ থেকে যদি আমরা সংগ্রামটাকে দেখি তাহলে সভ্যতার প্রতীক হিসেবে আমরা দাঁড়াতে পারবো না।

আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে আমাদের সমস্ত প্রতিভাগুলোকে, বৈচিত্র্যগুলোকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি এবং সেটার ভিত্তিতে আমরা একটা সুখী-সুন্দর দেশের দিকে অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছি। এই বোধ ও চেতনার ভেতরে আমাদের জাতিকে অগ্রসর হতে হবে। শাসকশ্রেণীর চরিত্র

আমাদের আছে। এই দেশের ভেতরে বর্তমানে যা হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং এতদিন ধরে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা কি দেখি নাই এই সময়ের ভেতরে; আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নগুলোকে একে একে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সমস্ত দেশে লুটের রাজত্ব চলছে। আজকের রাজনীতিবিদদের ভেতরে কমার্শিয়ালাইজেশন, ক্রিমিনালাইজেশন, অস্ত্র পাচার চতুর্দিকে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর প্রভাব পড়েছে। অনেক সময় এ রকম মনে হয়, আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সে যা পড়তাম- রাষ্ট্রের উপাদান মানে তার তিনটা উপাদান- লেজিসলেচার, এক্সেকিউটিব আর জুডিশিয়াল। আপনারা দেখবেন তার যে 'চেইন অব কমান্ড', তার যে নিয়ম-কানুন, কোন কিছুই আপনি এখন খুঁজে পাবেন না। প্রত্যেকে তার ব্যক্তিগত এজেন্টদের নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেটা যে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে এবং সেটা লুটপাটের এই যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে চরিতার্থ করার জন্যই আজকে আমাদের রাজনীতির ভেতরে, প্রশাসনের ভেতরে আমাদের সেই নীতি-আদর্শ, দর্শন সমস্ত কিছুর ভেতরেও প্রবেশ করে আমাদের ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তার ভিক্তিম আমাদের দেশের সমস্ত মানুষ, অধিকাংশ মানুষ, তারই ভিক্তিম হচ্ছে আমাদের এই যে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা অধিকার বঞ্চিত।

আপনারা তো অধিকার দেবেন না, কারণ পার্বত্য এলাকা থেকে দামী দামী সেগুন কাঠ কিনে আনতে পারলে পরে আমাদের অফিসার সাহেবদের, ব্যুরোক্র্যাট সাহেবদের সুবিধা হয়। ঐ জমি তাদের দখল করতে হবে, আমাদের গ্রামে গরীব বাঙালীকে টিকে থাকতে দেয়া হচ্ছে না। তাদের অর্থ ও শ্রম শোষণ করে নেয়া হচ্ছে এবং তাদের গোলমাল করলে বলে যে, তোমরা যাওগে পার্বত্য চট্টগ্রাম, তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করছি। সেটেলারদের কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসানো হয়েছিল জিয়াউর রহমানের আমলে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে; এই কথাগুলো বলেই তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং পুরো জিনিসটার ভেতরে একটা শোষন, একটা কায়েমী স্বার্থ। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন না করলে আপনার অধিকার আদায় হবে না, আমার অধিকারও আদায় হবে না। এই কথাটা বললাম আমি এই কারণে যে, সমস্ত বাংলাদেশে আজকে সময় এসেছে জাগরণের এবং অনেক সময় আমরা কথায় কথায় বলি কিন্তু আপনাদের কাছে বলছি এটা কথার কথা নয়। একবার আমরা ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম নতুন করে আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ করতে না পারলে এই বাংলাদেশকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারবো না এবং নিশ্চয়ই সে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা ৭১-এ যে পথ আমরা বরণ করেছিলাম কিংবা আমরা ধরে রাখতে পারি নাই সেই পথে এবার আমরা বিজয় অর্জন করবো। সেই পথ যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি এবং সমস্ত ৫৪ হাজার বর্গমাইলের প্রত্যেক নাগরিক তার নিজের সত্ত্বা এবং প্রত্যেক জাতি যাতে তাদের জাতিসত্ত্বাগত অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

আমি একটা অনুরোধ করতে চাই এবং অনেকেই বলে গেছেন, সন্তু লারমা উপস্থিত আছেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, ঢাকায় আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারছি। আপনাদের কথাগুলো আমাদের ভেতরে বিভ্রান্তিকরভাবে প্রচার করা হয়। আমাদের অনেকে জানে না, আমাদের বাঙালীদের ভেতরে বলে যে, এখনো তাদের ভেতরে শিক্ষা-দীক্ষা নেই, এই মাত্র তাদেরকে যদি আমরা স্বশাসন দিয়ে দিই তাহলে নিজেদেরকেও ভালোভাবে শাসন করতে পারবে না। একই কথা উচ্চারণ করতো বৃটিশরা যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার যোগ্য না। যারা ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা করে তাদের মধ্যে একই কথা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিভ্রান্তির কথা আমরা যদি সমগ্র জনগণের কাছে, যদি প্রকৃত সমস্যার স্বরূপ সকল শোষিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি তাহলে তারা এক হয়ে দাঁড়াবে এ ব্যাপারে আমার সামান্যতম সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র আপনার অধিকারগুলোর প্রশ্নই নয়, আমি একই সঙ্গে সবাইকে ভাববার জন্য বলবো শাসকগোষ্ঠী যাই করুক না কেন আমাদের এই দেশের সমস্ত সংস্কৃতি সমৃদ্ধ

করার দায়িত্ব আছে। সুতরাং ঢাকার মানুষের অধিকার আছে যে চাকমা, মারমা বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজন- তাদের জীবনযাত্রা, তাদের কালচার জানার। তা কেন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকবে, সেসব কি আমরা ঢাকায় করতে পারি না? দেশের বিভিন্ন জায়গায় করতে পারি না? তাতে একে অপরকে জানা এবং একাত্ম হওয়ার সুযোগ হবে। সেই একাত্মতাবোধ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেটা তখনই রচনা হবে যখন সেটার ভিত্তি হবে সাধারণ শ্রমজীবি খেটে খাওয়া মানুষ যারা পার্বত্য এলাকায় এক জাতিসত্ত্বার মানুষ হিসেবে বসবাস করছে, কিংবা বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা শ্রমজীবি মানুষ, এই শ্রমজীবিতে শ্রমজীবিতে যখন একাত্মতাবোধ একটা দৃঢ় ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলবে যে ঐক্যের দৃঢ়তায় আমাদের দেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অন্যান্য মানুষও প্রাণ খুঁজে পাবে। সেখান থেকে আমরা নতুন সভ্যতা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে পারবো, সেই মেহনতি মানুষের ঐক্যের ডাক দিয়ে আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

# পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে আন্দোলন অবশ্যই এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে

**আ স ম আব্দুর রব**

**উপদেষ্টা, জাসদ (রব)**

সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট জাতির বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সুধীমন্ডলী, আপনারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি প্রথমে ঐ মানুষটির কথা স্মরণ করছি, যার সাথে ১৯৭২ সালে আমার পরিচয় ছিল; তিনি আজ বেঁচে নেই; তাঁর আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই সেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে।

এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই অনুষ্ঠানে অধিকাংশই যুবক। তাদের অনেকেই এই স্মৃতি জানে না যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, আমি, পূণ্যলাল চাকমা, শান্তিময় দেওয়ান বর্তমানে যিনি মন্ত্রী তার পিতা, আমরা অনেকেই এক সাথে কাজ করেছি। আমি ৬০ দশকে রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির এলাকায় ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম। আজকে যে গৌতম দেওয়ান পৌরসভা ও পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন, তারা অনেকেই আমার সহযাত্রী ছিলেন।

আমি মনে করি বিষয়টি ব্যাপক, আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ সমর্থন দিলেও। আমি ধন্যবাদ জানাই কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড সেলিম সাহেবকে। সন্তুবাবু আমি আপনি এক সাথে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলাম। গ্রেফতার হলে ওখানে আসেন অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায়। আপনার মনে আছে কিনা জানি না।

সমস্ত কিছু বক্তৃতা দিয়ে বা খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লিখে বাস্তবায়িত হবে না। কিন্তু বেসিক ও ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসটি সেটা হলো সংবিধান পাঠ। কনষ্টিট্যুশনালি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত না হবে কতটুকু আপনি দেবেন, কি কি দেবেন, কি দেবেন না তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এটা বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল যে জিনিসটা আমি বলি সরকার বা বিরোধী দলের একক দলীয় রাজনীতির পক্ষে। সিভিল স্বৈরাচার আর নন-সিভিল স্বৈরাচার এসব বলে কোন লাভ নেই। দলীয় শাসনে যারা বিশ্বাস করেন, ব্যক্তি ক্ষমতায় যারা বিশ্বাস করেন তারা জনগণের, সব জাতিসত্ত্বার অধিকার ও ক্ষমতার কর্তৃত্বকে বিশ্বাস করেন না, তারা ভয় পান। আমি বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো আমি সন্তুবাবুর বক্তব্যের মধ্যে এবং অনেকের বক্তব্যের মধ্যে, সবাই যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমি 'উপজাতি' শব্দটির সাথে একমত নই। আমি একটি জাতিসত্ত্বা, আমি কেন বলবো উপজাতি? এবসোলিউটলি উপজাতি বলার মধ্য দিয়ে এই মানুষের মধ্যে, জলবায়ু-আবহাওয়াতে, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মগ, কুকি, হাজং, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, সাঁওতাল, রাখাইন, মনিপুরী, আমি সবাই জন্মগত, জাতিগত বাংলাদেশী। তারা যে এ মাটিতে জন্ম গ্রহণ করেছে তার যে অধিকার এবং ঠাঁই সেটাকে আমি 'সেকেন্ড ক্লাস' হিসেবে চিন্তাভাবনা করছি।

বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল এর বক্তব্য হলো বাংলাদেশ বহু জাতিসত্ত্বার দেশ, বহু জাতি এখানে আছে, বহু ভাষা আছে, স্বকীয়তা আছে, ঐতিহ্য আছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সাংবিধানিকভাবে আইনগতভাবে প্রত্যেকটি ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিয়ে তার সমস্ত কিছু লালন-পালন করার ব্যবস্থা করা। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ বলি বা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-মুসলমান ঐক্য পরিষদ করি কোন লাভ হবে না। সেকেন্ড ক্লাস হিসেবে বাঁচা এই মানসিকতা আপনাদেরকেও বর্জন করতে হবে এবং জাতিগতভাবে বাংলাদেশ বহু জাতিসত্ত্বার দেশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, এখানে বহু জাতিসত্ত্বা আছে। এই বিষয়টি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ ১৯৭২ সালে উত্থাপন করেছিলেন, সেই সাহসী এবং দুঃসাহসী মানুষ তাকে আমাদের অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। আর এর পরে চুক্তির মধ্য দিয়ে কিছু হয়নি আমি সেকথা বলতে চায় না, অবশ্যই এটা এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার জন্য সন্তুবাবুকে এবং আপনাদের জনসংহতি সমিতিকে ধন্যবাদ জানাই। আমার সাথে প্রথম যেটার পরিচয় হয়েছে সেটা ছিল পাহাড়ী ছাত্র সমিতি। আমি যখন ছাত্র সমিতির অফিসে রাঙামাটিতে কথা বলছিলাম তখন আমাকে বলা হয়েছিল যে, দাদা একটু আস্তে আস্তে কথা বলেন। বাইরে শুনতে পাবে। আজকে কিন্তু আমরা খোলাখুলি বলছি ঢাকার রাজধানীতে, জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে।

আজকে সার্বিয়ায় বা হারজেগোভিনাতে যে আন্দোলনটা হচ্ছে বা সংগ্রামটা হচ্ছে যাতে রক্ত ঝরছে, মানুষ মারা যাচেছ এবং রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়িতে যে লড়াই, পৃথিবীতে যে লড়াই এবং ১৯৭১ সালে যে লড়াই সেটা হলো আইডেন্টিটির লড়াই। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি ও জাতিসত্ত্বার অস্তিত্বের স্বীকৃতির লড়াই। জাতি হিসেবে সংখ্যায় কম হতে পারে, ক্ষুদ্র হতে পারে। আজকে কিন্তু সাওতাল, গারো, মগ, কুকি, চাকমা, ত্রিপুরা এসমস্ত, এখানে যারা উপস্থিত আছেন যুবক তারা অধিকাংশই একই বাংলাদেশী; ডক্টরেট ডিগ্রী থেকে এম এড ডিগ্রী করা বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক। আমি গারো এলাকায় কিছুদিন পালিয়ে থেকেছি, যেখানে আমার দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। সেখানে প্রায় ১০০% ভাগ শিক্ষিত। মামুনুর রশীদ সাহেব তিনিও একই সুরে কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আসল কাজটি হলো- সাংবিধানিকভাবে পার্বত্য অঞ্চলসহ সারা বাংলাদেশের সকল জাতিসত্ত্বাগুলোকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া; বিশেষ করে রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ির বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে স্বাতন্ত্র্য বজায় রয়েছে এবং পশ্চাদপদ হয়ে আছে। বান্দরবানে আমি স্পষ্টভাবে জানতাম বান্দরবানে প্রায় উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ মানুষ ছিলো। আমি জানি না এখন কি অবস্থা। আমার চেয়ে সন্তুবাবু ভালো বলতে পারবেন। তাদের মানুষ হিসেবে বাঁচা এবং রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। আমরা এই মাটির সন্তান হিসেবে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সম অধিকার নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে চাই। এটাই হলো আন্দোলন, এটাই হলো দাবী, এটাই হলো সংগ্রাম। বড় কথা হলো যে, আজকে ভাইয়ে ভাইয়ে, ধর্মে ধর্মে আমাদের এখানে যে একটা শান্তির নীড় গড়ে তুলেছি এটা যাতে আরো বেশী সমৃদ্ধ আকারে সারা ভৌগলিক এলাকায় কার্যকর করতে পারি।

আমি মনে করি রাজনৈতিক পক্ষরা রাজনৈতিক সমাধান করবেন। এই কথাটা এখানে আরেকজন এনেছেন। আসলে সামরিকভাবে কোন সমাধান সম্ভব নয়। আজকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা উঠেছে, সন্ত্রাস আরেকটা সৃষ্টি করে। তাই সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাধান হবে না। তাই এই বিষয়টার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বাংলাদেশকে চারটি প্রদেশ করে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাকে একটা প্রদেশ করে তা তাদেরকে পরিচালনা করা তথা তার সামগ্রিক উন্নতির জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর করার মধ্য দিয়েই এই জাতিসত্ত্বাগুলোর জন্মগত অধিকার ও এই মাটিতে তাদের উন্নত জীবন শুরু হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। এছাড়া অন্য কোনভাবে এটা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।

# শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না করে যে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করবে তার জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী থাকবে

**মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত**

**সভাপতি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ**

আমাদের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ সংগঠনটি গঠিত হয়েছে এখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান আদিবাসীদেরকে নিয়েই এবং আজকের যে বিষয়বস্তু তার সাথে আমাদের সংগঠনটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা আন্দোলন করেছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিলেন বলেই সরকার একটা চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই আমি বলবো আমরা যে সংগঠন করছি আমাদেরটা কোন রাজনৈতিক দল নয়, আমরা সাম্প্রদায়িক কোন কিছু করছিনে, আমাদের দাবী-দাওয়াগুলো আদায় করবার জন্যই আমরা আমাদের এই সংগঠন করেছি। আমি আজকে এখানে যে দাঁড়িয়ে আছি, আজকে জনসংহতি সমিতি যারা করছেন তাদের যে দাবী-দাওয়াগুলো, আমরা আমাদের এই দাবী-দাওয়াগুলো আদায় করবোই করবো। আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না। এখন আমি বলবো এই যে এগুলো হচ্ছে- আমি বলবো এগুলো পাকিস্তানের সময় থেকে শুরু হয়েছে। কেন বলছি? কারণ আমি তখন একবার পার্বত্য চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম ১৯৬২ সালে, তখন আমাদেরকে সার্কিট হাউজে থাকতে দেওয়া হয়েছিলো, তখন আমি দেখলাম সার্কিট হাউজের সামনে বিশাল বন আর জলাশয়। জলটা এতই স্বচ্ছ ছিলো যে তাতে দু'তিনটা বাড়ী দেখা যাচ্ছিলো। তখন আমার মনে হয়েছিলো যে, এরা গেল কোথায়? এর পরেই জানতে পারলাম এরা নিপীড়িত, নির্যাতিত এবং জোর-জবরদস্তি করে এদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল।

আমার যা মনে হয়েছিল পাকিস্তানের সময় থেকেই এই চক্রান্তটা চলছিল এবং আজো চলছে। এটা কি? সাম্প্রদায়িকতা! এই যে চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস, এর থেকে জুম্মদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া, একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এটাকে ইসলামাইজেশন করার একটা চক্রান্ত চলছিলো। এই যে চক্রান্ত চলছিলো, এটার জন্য কিন্তু আমি যেটা দেখছি, এই যে জনসংহতি সমিতি যেটা করছে, তাদের আন্দোলনটা কিন্তু ভালোভাবে চলছে এবং এটা করতে হবে। এখন সময় হয়ত লাগতে পারে। কিন্তু ব্যাপার হলো যে এটা না করে আমাদের উপায় নেই। সেজন্য বলছি, আজকে আমি যে সংগঠন করছি, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ আপনারা করছেন, আমরা তাদের সঙ্গে থাকবোই থাকবো এবং তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করবো। তবে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে- আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং আমাদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আগেও চলেছিল, এখনও চলছে। এই চক্রান্ত হলো- আমাদের মধ্যে, আপনাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আমাদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি সৃষ্টি করে দিয়ে প্রচেষ্টা চালানো যাতে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত না হয়। তাই আমি অনুরোধ করবো

আপনাদের নিজেদের ভুল বুঝাবুঝি শেষ করেন, ঐক্যবদ্ধ থাকেন এবং আমার যা মনে হয় বাংলাদেশের যারা চিন্তাবিদ আছেন তারা আপনাদের সঙ্গেই থাকবেন। এই যে শান্তি চুক্তি তা বাস্তবায়িত করতেই হবে। তাই আমি বর্তমান সরকারের কাছে অনুরোধ করছি- অনতিবিলম্বে আপনারা শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করেন। আর যদি না করেন তাহলে বাংলাদেশে যে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করবে তার জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী থাকবে। তাই আমি কেবল অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে- আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকবেন, আপনারা আপনাদের আন্দোলন চালিয়ে যান। আপনারা সফল হবেন- এই প্রার্থনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

# অবিলম্বে চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সকল সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে পার্বত্যাঞ্চলে সেনাশাসনের অবসান করা হোক

**হাসানুল হক ইনু**

**সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)**

সহযোদ্ধা সন্তু লারমা, মঞ্চে উপবিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সুধীবৃন্দ। উপস্থিত জুম্ম জনগণের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদেরকে সালাম জানাচ্ছি চুক্তিটাকে পাঁচ বছর ধরে রাখার জন্য এবং চুক্তির বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করার জন্য। জাসদের পক্ষ থেকে আমরা সব সময় ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের, আদিবাসীসমূহের সংগ্রাম, অধিকারের আন্দোলনকে সমর্থন করে আসছি এবং বর্তমানেও করছি, ভবিষ্যতেও করবো।

আমার ছোট্টকালের সময়টা পার্বত্য চট্টগ্রামে কেটেছে। সেই সূত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে সবসময় সম্পর্ক আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনার কর্ণফূলী পেপার মিল হাই স্কুল থেকে আমি এসএসসি পাশ করেছিলাম এবং ছোটবেলায় আমার বহু সহপাঠি ছিলো। সেই থেকে আমি জুম্ম জনগণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে, তাদের জীবন-যাত্রার সাথে পরিচিত। আমার চোখের সামনেই কর্ণফূলী নদীতে বাঁধ দেয়া হয় এবং সেখানে কাপ্তাই হ্রদের সৃষ্টি করা হয়। আমি সেই ছোট বেলায় চট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রঘোনা হয়ে রাঙামাটি যেতাম এবং সেই পাহাড়ী নদী ও এলাকায় ঘোরাফেরা করার অভ্যাস ছিল আমার। কিন্তু সবকিছুই পাল্টে যায় বাঁধ তৈরী করার সময়। তারপরের ইতিহাস আপনাদের জানা আছে। আজকে আবার আমরা সবাই এখানে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করছি চুক্তি ধরে রাখার জন্য। একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল যে, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না বা চুক্তি বানচাল করতে চাচ্ছে। যে সন্দেহ ছিল চুক্তি হওয়ার পর থেকে। সন্তু লারমা প্রথমেই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

চুক্তি একটা বিরাট মাইল ফলক, অর্জন; কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না করা এই সরকারের এবং বিগত সরকারের দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার সমালোচনা আমি প্রথমেই করছি এবং এই সমালোচনা করে বলছি- চুক্তি বাস্তবায়ন করা ছাড়া সরকারের কোন উপায় নাই, নাই, নাই। আমাদের কোন অবস্থাতেই চুক্তি বাস্তবায়ন না করে পেছনে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই এবং শান্তির স্বার্থেই চুক্তি রক্ষা করতে চাই এবং চুক্তির বাস্তবায়ন চাই।

আমি আপনাদের বলতে চাই, গায়ের জোরে নারীকে দখল করা যায়, প্রেম করা যায় না; গায়ের জোরে অবৈধ ক্ষমতা দখল করা যায়, কিন্তু সেই ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। গায়ের জোরে এলাকা দখল করা যায়, কিন্তু এলাকা শাসনে রাখা যায় না। তার প্রমাণ পার্বত্য চট্টগ্রাম, তার প্রমাণ বাংলাদেশ। ৭১-এ পাকিস্তানীরা পরাজিত হয়েছে আর এই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়ে সরকার দেখিয়ে দিয়েছে সামরিক বাহিনী দিয়ে এলাকা শাসনে রাখা যায় না, যায় না।

সংগ্রামী সাথী ও ভাইয়েরা আমার, শাসকেরা দীর্ঘ ৩০ বছরে বাঙালীর ললাটে যে কলঙ্ক লেপন করেছে আমরা সাধারণ বাঙালীরা, গণতন্ত্রমনা নেতা-কর্মীরা সেই কলঙ্ক মোছার জন্য আপনাদের ন্যায্য সংগ্রামে সমর্থন জানিয়ে সেই কলঙ্ক মোছার চেষ্টা করছি। আপনারা ভুল বুঝবেন না, এটা বাঙালীর সঙ্গে পাহাড়ী জনগণের কোন যুদ্ধ নয়। এটা বাঙালী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পাহাড়ী জনগণের যুদ্ধ ছিলো; যে যুদ্ধে আমরা আপনাদের পক্ষে ছিলাম এবং আপনাদের সব সময়ের দাবীর পক্ষে ছিলাম।

আমি এটুকু বলবো যে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বা জাতিসত্ত্বা অস্বীকার করা অত্যন্ত খারাপ জিনিষ এবং এটা একটা রাজনৈতিক ভুল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জানবক্স খাঁ, আপনাদের রাজা বৃটিশদের আধিপত্য মানেন নি এবং ৭১-এর বিজয়ের পরে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই একই কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে- আমরা পাহাড়ী জনগোষ্ঠী চাকমা, মারমা, ত্রিপুরারা আমাদের জাতিগত স্বীকৃতি চাই। ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চারদফা দাবীনামা পেশ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেই চারদফাকে অস্বীকার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপিতা, তিনি বিরাট নেতা, কিন্তু উনার এটা বিরাট রাজনৈতিক ভুল ছিলো। সেই ভুলের খেসারত বছরের পর বছর আমাদের দিতে হয়েছে এবং সেই ভুলের খেসারত সংশোধন করেছেন তার কন্যা শেখ হাসিনা চুক্তি সম্পাদন করে। মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদার ধারাবাহিক ভুল সংশোধনই হচ্ছে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি। সুতরাং ভুল শোধরানোর যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই আমরা আরেক ধাপে এগিয়ে যাবো। এই চুক্তি অস্বীকার করে আরেকটা ঐতিহাসিক ভুল আমরা করতে চাই না। সুতরাং সরকারকে আমরা বলবো ভুল শোধরানোর ঐতিহাসিক যে চুক্তি তা রক্ষা করেন এবং বাস্তবায়ন করেন। যাতে এই সমগ্র জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক বজায় থাকে।

সংগ্রামী সাথীরা আমার, ১৯৭১ সালে যে ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ, এই মুক্তিযুদ্ধ এটাই প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকভাবে বহু ধর্মের বসবাস, উপমহাদেশে বহু জাতিসত্ত্বার বসবাস সেখানে অখন্ড ভারততত্ত্ব এবং ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্ব দুটি ঐতিহাসিক ভুল তত্ত্ব। সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছিলো ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, বাঙালী জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পরেই এই ভুল তত্ত্ব প্রমাণিত হয় এবং এই ভুল তত্ত্বের বদলে সমগ্র জাতিসত্ত্বাকে স্বীকার করো, ধর্মকে স্বীকার করো, সেই প্রেক্ষিতে জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, ধর্মকে সম্মান দেয়া হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়। কিন্তু বাঙালীর সেই বিজয়ের পরে, বাংলাদেশের বিজয়ের পরে বিজয়ের অহংকারে হয়ত একটা ঐতিহাসিক ভুল হয়েছে যখন ৭২-এ বাংলাদেশের সংবিধান রচনা হয়েছে। সেই ৭২-এর সংবিধানে একটা বড় ত্রুটি- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ওখানে সঠিকভাবে লেখা হয়নি। অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যাপারে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। স্বশাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও স্বশাসনের পরিধি ও ক্ষমতার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এই ত্রুটি থেকেই সমস্যার সৃষ্টি, এই ত্রুটি থেকেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্ম।

আমরা ১৯৭২ সালে যে সংবিধান এই সংবিধানের ত্রুটি সংশোধন করার জন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই এবং অনগ্রসর শ্রেণীকে টেনে আনার জন্য তাকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই এবং তার অধিকার ও ক্ষমতা নিশ্চিত করতে চাই। একই সাথে স্বশাসনের পরিধি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে চাই। স্বাধীন দেশে আপনারা জেনে রাখবেন কখনো শাসক-শাসিত নেই, স্বাধীন দেশে স্বশাসন চলে। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হওয়ার পরে এখানে হয় নির্বাচিত স্বৈরাচার না হয় সামরিক স্বৈরাচার দেশ শাসন করেছেন এবং তারা শাসকের মতন ব্যবহার করেছেন বলেই এই রক্ত ক্ষরণ এবং রক্তপাত। সুতরাং আপনারা যারা আজকে এখানে মিলিত হয়েছেন আমি আপনাদের সামনে সন্তু লারমার মুখ থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ভূমি সমস্যা, ভোটার তালিকার সমস্যা, সেনাক্যাম্পের

সমস্যা এবং শরণার্থীদের পুনর্বাসন সমস্যা- এই চারটি জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করা দরকার। সেখানে আমি আপনাদের সাথে একমত যে, ভূমি সমস্যার সমাধান হচ্ছে মূল কথা এবং ভূমি কমিশন গঠন করা দরকার এবং আপনাদের উত্থাপিত সংশোধনীগুলো অবিলম্বে বিবেচনা করে ভূমি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

আমি একই সাথে বলবো চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এটি মনিটরিং কমিশন তৈরী করা দরকার, যে কমিশন ধারাবাহিকভাবে চুক্তির অন্তর্বর্তী সফলতা-ব্যর্থতা বিবেচনা করবেন। একই সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের একটি ইনষ্টিটিউট তৈরী করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়নের ব্যাপারে বহু অভিযোগ আছে এবং এই বনায়নের ব্যাপারে স্থানীয় পরিষদের সম্পৃক্ততা এবং পরামর্শের ভূমিকা নির্ধারণ করা দরকার - যাতে বনায়ন স্থানীয় পরিষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে বনায়ন হয়।

একই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে যে বিরাট ত্রুটি আছে যেখানে আদিবাসীদের সম্পর্কে, জুম্ম জনগণ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য নাই। সুতরাং শিক্ষার কারিকুলামে আদিবাসী এবং বাংলাদেশের এই গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তথ্য সংযোজিত করা হোক। একই সাথে সাথে এখানে একটা ভুল ধারণা আছে বাঙালীদের বা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের, ভুল ধারণাটা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল জায়গা পড়ে আছে, ওখানে যাও বসতি করো, চাষাবাদ করো। এই কথাটা ঠিক না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই জমি নাই, মাত্র ৭৬ লক্ষ একর জমি আছে, আবাদী ফসল আছে এবং এটা যথেষ্ট নয়। এমনকি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং সেখানে নতুন বসতি স্থাপন সম্ভব না এবং প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিও সম্ভব না। সুতরাং এটা একটা কঠিন অবস্থা। পার্বত্য চট্টগ্রামকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে জনসংখ্যার বর্ধিত চাপ তা বহন করতে পারবে না। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করারও একটা ষড়যন্ত্র চলছে। সুতরাং এখানে দরকার একটা বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা, সৌরশক্তি ব্যবহার দরকার, মৌমাছি, মাশরুম, কমলা, গোলমরিচ, রাবার চাষের দরকার, ফুল চাষের দরকার, অর্কিড চাষের দরকার, কল-কারখানা দরকার, সেগুন বাগানের নীতি পরিবর্তন করা দরকার। টিমবার প্লান্টেশন এটা রিনিউ করা দরকার এবং সাজেক ভেলীতে রোপ-ওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, ক্ষুদ্র বিবেচনায় যে উন্নয়নের বিকল্পগুলো আমরা উত্থাপন করলাম আমার মনে হয় আপনারা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্নটাকে যদি সম্পৃক্ত না করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনারা এগুতে পারবেন না। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আবারও বলবো- সেনাক্যাম্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, আভ্যন্তরীণ ইন্সার্জেন্সী মোকাবেলার জন্য সেনাবাহিনী কখনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং ওখানে আজকে চুক্তি বাস্তবায়নের বদলে অঘোষিত সামরিক শাসন চলছে এবং অপারেশন উত্তরনের নামে সেনাশাসন চলছে, অবিলম্বে চুক্তি মোতাবেক অস্থায়ী সকল সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে সেনাশাসনের অবসান করা হোক। চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ কার্যকর করেন, ভূমি কমিশন চালু করেন, শরণার্থীদের পুনর্বাসন করেন। আমি যুদ্ধের বদলে চিরস্থায়ী শান্তি চাই, চিরস্থায়ী শান্তির জন্য চুক্তির উপর নাই এবং চুক্তি বাস্তবায়ন করা হোক এই আহ্বান জানাই।

পরিশেষে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে ঐতিহাসিক ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই চেষ্টা হিসেবে যে সংগ্রাম করেছেন এবং সেই সংগ্রামের একটা পর্যায়ে সন্তু লারমার নেতৃত্বে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে- সেই চুক্তি রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠী আপনাদের পাশে থাকবে, চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামে আমরাও আপনাদের পাশে থাকবো- এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মেহনতি মানুষের জয় হোক, বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

# চুক্তি যদি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে এর পরিণাম আমাদের জন্য শুভ হবে না

**ড. আনিসুজ্জামান**

**অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

আমার প্রিয় সন্তু লারমা, মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ, সমবেত সুধীবৃন্দ। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আমি দু'একটি কথা পুনরাবৃত্তি করবো। ১৯৯৭ সালে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হলো, তখন আমরা সকলেই সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংঘাত-সংঘর্ষ নিরসনের পথে এটা বড় পদক্ষেপ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দীর্ঘ পাঁচ বছরে এই পার্বত্য চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলো না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি এই চুক্তি বাস্তবায়িত না হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সব মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগ্রাম করার চেষ্টা করছিলেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন, তাদেরকে যদি দুর্বল করে দেয়া হয় তাহলে এর পরিণাম আমাদের জন্য শুভ হবে না। সুতরাং আমরা আশা করবো এবং আমরা দাবী করবো যত শীঘ্র সম্ভব এই শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত করা হোক। এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে আমরা সকল জাতিসত্ত্বার শান্তিপূর্ণ জীবন কামনা করি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই জাতিসত্ত্বাগুলিকে সাহায্য করা বলে মনে করি। আমরা এই রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে সেই দায়িত্ব পালনে নিজেদের যে ভূমিকা ও কর্তব্য সেটি স্মরণ করবো এবং আশা করবো আমাদের মধ্যে যে সমস্ত বিভক্তি ও ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত হয় সেগুলো যাতে চিরতরে নির্মূল হয় আমরা সেই চেষ্টা করবো।

# সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যদি আমরা যথাযথভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারি তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা বার বার বিপদের মুখে পড়বো

**কমরেড রাশেদ খান মেনন**
**সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি**

আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও আলোচকবৃন্দ। আমি প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশেষ করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জনসংহতি সমিতির নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু লারমাকে। তার রাজনৈতিক নেতৃত্বে আজকের এই চুক্তি সম্পাদিত হতে সম্ভব হয়েছিল তার জন্য এবং আজকের এই যে চুক্তি বাস্তবায়নের যে লড়াই ধৈর্য ধরে পরিচালিত হচ্ছে তার জন্য তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার জন্য আজকে এটা খুশীর দিন এই কারণেই যে এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়ার সাথে আমি নিজেই সংযুক্ত ছিলাম এবং বিএনপি শাসনের নব্বই উত্তর যে প্রথম ৫ম সংসদকে কেন্দ্র করে যে শান্তি চুক্তি, শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেই প্রক্রিয়া চালু করতে গিয়ে আমার সুযোগ ঘটেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া। সেই সময় আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছি সে কথা আজকেও বলবো। সেদিনও বলেছিলাম যে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের এই সমস্যা, এটা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর সমস্যা নয়। এটা আমাদের জাতীয় সমস্যা এবং এটা সমাধানের পথ কেবলমাত্র পার্বত্যবাসীর নিজের রাখা সংগ্রামে চলবে না। এটার মূল ভূখন্ডে যে বাঙালীরা আমরা রয়েছি, বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের শান্তি চুক্তিতে উপনীত হতে হবে তো বটেই পার্বত্য সমস্যা সমাধান করতে হবে এবং সামগ্রিকভাবে এর একটি রাজনৈতিক সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

আজকে আমরা আনন্দিত এই জন্যে যে বিশেষ করে যে এই শান্তি চুক্তির ৫ বছরে এসে ঢাকাতে অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূল ভূখন্ডে যারা আমরা বাস করি, যারা বাঙালী, আদিবাসী যারা রয়েছেন তাদের কাছে পার্বত্যবাসীরা তাদের যে কথাগুলো আরো অনেক স্পষ্ট করে সামনে নিয়ে আসবেন। আজকে যদি ঠিক ঈদের আগ মুহূর্তে, ছুটির দিনের ঠিক আগ মুহূর্তে না হতো তাহলে হয়তো আজকের অনুষ্ঠান অনেক বড় মহামিলনে পরিণত হতে পারতো। আমরা আশা করবো আগামী দিনে যখন এই পার্বত্য শান্তি চুক্তি উৎসব আপনারা উদযাপন করবেন বা এই ধরনের যে কোন অনুষ্ঠান যদি আজকে ঢাকা বা এই ভূখন্ডের সাথে সংযুক্তি সাধন ঘটে তাহলে সেটা অনেক ভালো হবে।

আমি যে কথাটা একই সঙ্গে আজকে বলতে চাই, আজকের এই চুক্তি বাস্তবায়নের যে প্রশ্ন এসেছে সেটাও কিন্তু কেবলমাত্র পার্বত্যবাসীদের একা করলে আমি মনে করি সমাধান করা সম্ভব হবে না। কারণ যে বাধাগুলো শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সময় ছিল সে বাধাগুলো এখনো রয়েছে। সে বাধা

অতিক্রম করেই এই শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি পার্বত্যবাসীদের সংগ্রামে বিজয়ের একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ এবং একই সঙ্গে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়ের একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। কারণ আমরা এটা সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলাম দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছরের মতো লড়াইয়ের পর যখন বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি চলছিল তখন অন্ত তপক্ষে এটুকু বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম শাসকগোষ্ঠীকে যে, সেনাশাসন দিয়ে নয়, সামরিক অভিযান পরিচালনা করে নয়, এটা আলোচনার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বোধের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাধানে পৌছতে হবে। সুতরাং আজকের দিনেও এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পার্বত্যবাসীদের লড়াইয়ের সাথে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক এবং পাশাপাশি হাত ধরে চলার সম্পর্কটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি এই দিকে আজকের এই দিনে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

এই কথা আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, এই সমস্যার মূল যে বিষয় তা হচ্ছে রাজনৈতিক। এই রাজনৈতিক বিষয়ের মূল যে জায়গাটি সেটাও এখানে উচ্চারিত হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে, আদিবাসীদের, সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আমরা সব ভালো জিনিষগুলোকে সংশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হয়েও আমরা আমাদের শুরুতে একটা বড় ভুল করেছিলাম। সেই ভুলটি ছিল যে আমাদের সংবিধানে আদিবাসীদের, সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে পারি নাই। আমরা যারা লড়াই করলাম, মুক্তিযুদ্ধ করলাম, আমাদের নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে নিজেরা সোচ্চার হলাম আমরা তারাই নিজের ভুখন্ড লাভ করে আবার ভুলে গেলাম যে আমাদের এই ভুখন্ডের মধ্যে আমরা বাদেও আরও অনেক জাতিগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের স্বীকৃতি একান্ত প্রয়োজন। আমরা ভুলে গেলাম যে একটি জাতির পরিচয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একক জাতিসত্ত্বাই তার শক্তির কারণ নয়। একই সঙ্গে জাতির বৈচিত্র্য যে রয়েছে সেই জাতির বৈচিত্র্য সেই জাতিকে আরও অধিক শক্তিবান করে এবং সেই জাতি বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই তারা develop করে।

আমাদের এখানে যে সংকট, যে সমস্যাগুলি আছে সেই সমস্যাগুলোকে দূর করা যায়। এটা কেবলমাত্র আমাদের দেশের স্বীকৃতি নয়, আজকের সারা পৃথিবীর ব্যাপার। আজকে পৃথিবীর দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে আমরা দেখবো সমস্ত পৃথিবীতেই এখন এই আদিবাসীর প্রশ্নটি প্রধান প্রশ্ন হিসেবে আসছে এবং ethnicityর তার recognitionর প্রশ্ন ও তার অধিকার কায়েমের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে এসেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, আমাদেরকে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ের মধ্য দিয়ে, দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, দীর্ঘ ক্ষতি স্বীকারের মধ্য দিয়ে এ সমস্যাটি বুঝতে হয়েছে। আজকে তাই আমি বলবো যে, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ক্ষেত্রে তার সমাধানের প্রশ্নে যদি আমাদেরকে আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হয় এবং এই চুক্তির উপর দাঁড়িয়ে যদি সমস্যা সমাধান দিতে হয় তাহলে প্রথম যে কাজটি আমাদের সবাই মিলে করতে হবে সেটা হচ্ছে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি আমাদের রাজনীতির অন্যতম মূল বিষয়ে পরিণত করতে হবে এবং শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সাথে এই সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে ভুলটি ছিল সেই ভুলটিকে সংশোধন করতে হবে। আমি মনে করি এই প্রশ্নটিকে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলধারার মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হিসেবে সামনে নিয়ে আসতে হবে।

**দ্বিতীয়তঃ** যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে উপস্থিত সেটা হচ্ছে যে, আজকে এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সেনা নিয়োগ করেছিলাম এবং এই সেনা নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে পার্বত্যবাসীদের কাছেই কেবল নয়, আমাদের সারা দেশের মানুষের কাছে একটি খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করে যে, সেনাবাহিনী দিয়ে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায়। কিন্তু পার্বত্যবাসীরা প্রমাণ করেছেন, আমরা

প্রমাণ করেছিলাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে, সেনাবাহিনী দিয়ে মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না। সে কারণে আজকে চুক্তিকরণ এবং চুক্তি সম্পাদন হবার পরও যখন অপারেশন দুর্বার, সেটাকে আবার অপারেশন উত্তরণে পরিণত করা হয় তখন এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। সুতরাং আমি স্পষ্ট ভাষায় আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই সারা দেশে আমাদের সন্ত্রাস দমনের সেনা অভিযান চলছে তখনও একইভাবে বলবো যে মানবাধিকার লংঘনকারী এই ধরনের সেনা অভিযান, এই ধরনের সেনাশাসন বা এই ধরনের সামরিক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধান হয় না। আজকে এই মুহূর্ত থেকেই কেবল সারা দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তা নয় পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও আজকে সামরিক বাহিনীর এই কর্তৃত্ব অবসানের দিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমরা আশা করবো সরকার যদি সত্যিকার অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি কামনা করে থাকেন তাহলে সেখানে এই যে অপারেশন উত্তরণের নামে পরোক্ষভাবে সেনাশাসন চলছে তা তারা বাতিল করবেন। সেখান থেকে তারা অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করবেন।

**তৃতীয়তঃ** যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সাথে মূল যে প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে যেটা আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সেটা হচ্ছে তাদের ভূমির প্রশ্ন। এই ভূমির প্রশ্ন বাদ দিয়ে পার্বত্য সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এই প্রশ্নে সন্তু লারমা এখানে উল্লেখ করেছেন ভূমি কমিশনের কথা এবং আমি মনে করি ভূমি কমিশনের প্রশ্নটিকে বাদ দিয়ে বাদবাকী অন্যান্য বিষয়গুলোকে যদি আমি বার বার প্রতিটা অংশ বাস্তবায়িত করতে চায় তাহলেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। সেই জায়গাতেই বলবো যে, ভূমি কমিশনের প্রশ্নটি নিয়ে এসে পার্বত্যবাসীদের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যে ভূমি অধিকারের প্রশ্ন সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে এসে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হবে এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই ভবিষ্যতের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

**চতুর্থতঃ** যে প্রশ্নটি আসছে, যার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে, সেই প্রশ্নটিকে আমাদেরকে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে। সেটি হচ্ছে ভোটার তালিকার প্রশ্ন। আমাদের সংবিধানে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, একটি মাত্র ভোটার তালিকা থাকবে সারা দেশের জন্য। সেই ভোটার তালিকার প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের জন্য একটি ভোটার তালিকা, আর জাতীয় পরিষদের জন্য আর একটি ভোটার তালিকা - এ দুটো একসঙ্গে চলে না এবং আজকে নির্বাচন কমিশন, আমাদের সরকার ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেছেন আমি মনে করি সেটি সংশোধন করতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কথা সেখানে বলা আছে- এই প্রশ্নটিকে আমাদের সমাধান করতে হবে।

বন্ধুগণ, এ ধরনের চুক্তির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আমরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে পারি। তবে আমি একটি দিকের প্রতি আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটি হল যে- এই চুক্তি সম্পাদনের সময়ে আমরা যে সমস্যা দেখেছি এবং চুক্তি বাস্তবায়নের পর্যায়েও আমরা একই সমস্যা দেখছি। সেটি হচ্ছে যে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন বা এই ধরনের সমস্যা সমাধান যেন না হতে পারে তার জন্য সব সময় যে একটা মহল বা শক্তি রয়েছে এবং তাদের হাতে যে হাতিয়ারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা, সেটি হচ্ছে জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা। উভয় সাম্প্রদায়িকতাকে তারা ব্যবহার করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান যাতে হতে না পারে, পার্বত্যবাসীরা যাতে বিভক্ত থাকে, পার্বত্যবাসীদের মধ্যে যাতে সব সময় সমস্যা-সংকট জিইয়ে থাকে সে চিন্তাই তারা মাথায় রেখেছেন। এ কারণে আমরা দেখবো যে, ওখানে যে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো তৎপর রয়েছে সে মৌলবাদী গোষ্ঠীদের অন্যতম শ্লোগান হচ্ছে, অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে ধর্মীয় শ্লোগান, ইসলামী শ্লোগান। বিশেষ করে যে বাঙালীরা সমতল থেকে গেছেন, সেখানে আশ্রয়-নিয়েছেন এবং সেখানে শরণার্থী হিসেবে

পুনর্বাসিত হয়েছেন, তাদের মধ্যেই মূলতঃ এই মৌলবাদী চক্র এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন।

খেয়াল করে দেখবেন যে, সেখানে বাঙালী জাতীয়তার চাইতেও আজকে ধর্মীয় জাতীয়তার প্রশ্নটিকে প্রধান হিসেবে তারা নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং তার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র পার্বত্যবাসীদের থেকেই তাদের পৃথক রাখছেন না, মূল ভূখন্ডের মানুষের কাছেও বিষয়টিকে তারা বিভ্রান্তিমূলকভাবে হাসিল করার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে যদি আমরা যথাযথভাবে হিসাবের মধ্যে নিতে না পারি এবং এই বিভক্তির জায়গাটাকে যদি আমরা রুখে দাঁড়াতে না পারি তাহলে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা বার বার বিপদের মুখে পড়বো। যেমনভাবে আমরা দেখেছি- প্রতিবারই চুক্তির বর্ষপূর্তি সময়কালে বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের চক্রান্তগুলো হয়ে থাকে। সম্প্রতি সালাহ উদ্দীন কাদের চৌধুরীর উপস্থিতিতে একটি সভা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং সেখানে তারা এই প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন এবং নিয়ে এসে ইউপিডিএফকে সমর্থন করার প্রশ্নে যুক্তি পর্যন্ত এ জায়গাতে নিয়ে আসছেন যে এখানে সবাইকে থাকতে দিতে হবে।

আমার এ কথাগুলো, সংসদের আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমরা দেখেছি যে- কিভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটাকে সামনে নিয়ে আনা হয়। সেই কারণে আমি বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের কাছে এবং পার্বত্যবাসীরা যারা রয়েছেন তাদের কাছে, এই সাম্প্রদায়িকতার সংবেদনশীল প্রশ্নটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলবো। একই সঙ্গে আমি বিশেষ করে বলবো যে, পার্বত্যবাসী শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন এবং এটা তাদের সাফল্য। কিন্তু সমতলেও আদিবাসী রয়েছেন এবং এই আদিবাসীরা আপনাদের চাইতে অনেক অনেক বেশী নি:গৃহীত। আপনাদের যেমন একটি ভূখন্ড রয়েছে, একটি জায়গার মধ্যে সবাই সমবেত হয়েছেন কিন্তু সমতলের আদিবাসীদের সে ধরনের কোন ভূখন্ড নেই। সমতলের আদিবাসীদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, তারা এই জমি আবাদ করে ফসল ফলিয়ে এসব জমি থেকে প্রতিদিন উচ্ছেদ হন। সমতলের আদিবাসীদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, তারা এদেশের কৃষক আন্দোলনের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্নে অংশ গ্রহণ করেও বিতাড়িত হয়েছেন দেশ থেকে। সুতরাং আজকে পার্বত্যবাসীদের এই লড়াইয়ের সাথে সমতলের আদিবাসীদের লড়াইটিকে অর্থাৎ সামগ্রিক আদিবাসীদের লড়াইটিকে একীভূত করে রাখা এবং সাথে সাথে বাঙালী-পাহাড়ী আদিবাসী সবাই মিলে একত্রিত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি আমাদের সামনে অত্যন্ত জরুরীভাবে উপস্থিত হয়েছে। আমি তাই সেইদিকেও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

সর্বশেষে যে কথা আমি আপনাদের বলতে চাই তাহলো- আমার জীবনের একটা সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের এই শান্তি প্রক্রিয়ায়, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়ায়, আপনাদের লড়াইয়ের প্রক্রিয়ায় আমাদের দল ওয়ার্কার্স পার্টি এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি। আপনাদের আশা-আকাঙ্খার সাথে আমরা সামিল আছি। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে, তার প্রতিটি ধারা যেন বাস্তবায়িত হয় সে প্রশ্নে আমরা সামিল থাকবো। আমরা কেবলমাত্র আপনাদের কাছে এটুকু আশা করবো এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার সাথে জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্যবাসী আদিবাসীরা সবাই মিলে সামিল থাকবেন।

আসুন, সবাই মিলে আমরা লড়াই করে এই বাংলাদেশটিকে সমস্ত জাতির জন্য, সমস্ত ধর্মের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য বাসযোগ্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

# সংবিধান ও শান্তি চুক্তিকে পরিপূরক হিসেবে ধরে নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করতে হবে

**ড. কামাল হোসেন**
**সভাপতি, বাংলাদেশ গণফোরাম**

এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত আদিবাসী ভাই ও বোনেরা। আজকে শান্তি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ৫ বছর হয়েছে। দুঃখজনক যে, আমাদেরকে সমবেত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে যে, এটা বাস্তবায়িত হয়নি কেন? শান্তি চুক্তি একটা পবিত্র দলিল। সংবিধান যেমন পবিত্র, শান্তি চুক্তিও পবিত্র। সারা জাতি আজকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে একে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আমাদের সকলের মৌলিক কর্তব্য। আমি আজকে এই প্রকাশনাটা পেয়ে যখন দেখি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, তখন আমাদের সেই ৭২ এর দিনগুলো মনে পড়ে। তখন গণ পরিষদের দুই তরুণ সদস্য দুই তরুণ আইনজীবি হিসেবে আমরা একসঙ্গে বসেছি, এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্বপ্ন দেখেছিলেন যে অতীতের যে শোষণ তার অবসান হবে, অতীতে যেসব অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিলেন তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দুই তরুণ বন্ধুর মন খুলে আলাপ করার যে সুযোগ ছিল সেই সুযোগ নিয়ে কিন্তু আমি উনার সঙ্গে অনেক মন খুলে আলাপ করেছি।

আজকের কথায় আসছে যে সংবিধানের কোন ভাষার ত্রুটি। আমি স্বীকার করতে পারি যে তখনকার পটভূমিতে সেটা মনে করি নাই যে সেটা ভাষার ত্রুটি। এখনকার পটভূমিতে অভিজ্ঞতার আলোকে ভাষার কোন ঘাটতি থাকলে তা অবশ্যই পূরণ করা যেতে পারে। আমি এই কথা বিনাদ্বিধায় বলতে পারি যে, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আর আমার মধ্যে যে মন খোলা আলাপ হয়েছিল তাতে আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নীতির দিক থেকে কোন রকম মতবিরোধ কোন দিন হয়নি। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ- তাদের যে আকাঙ্খা, তাদের যে অধিকারের দাবী এগুলো পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হোক। এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন রকমের দ্বিধা ছিল না। অর্থাৎ আজকে যেটা বলি ভাষার ত্রুটি তা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে ভাষা অবশ্যই আরো উন্নত করা যেতে পারে। শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে মনে করা যায় যে জিনিসগুলোকে আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সেই কারণে বলি যে, সংবিধানের পরিপূরক শান্তি চুক্তি। যদি এর মধ্যে কোন রকমের অসামঞ্জস্য থাকে সেটাকেও মিটিয়ে দেয়া কোন সমস্যা নয়।

আসলে জিনিসটা কোথায় এসে বেঁধেছে আজকে তা আমাদের অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা দরকার যে, এই ৩০ বৎসরে শান্তি চুক্তির পাঁচ বৎসর, সংবিধানের ৩০ বৎসর। ৭২ থেকে ২০০২। আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, বাংলাদেশের শোষিত মানুষ তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সংবিধানে যে সব কথা লেখা আছে- মানবাধিকারের কথা, মৌলিক অধিকারের কথা সেগুলো ৩০ বৎসরেও বাস্তবায়িত হয়নি। সেই কারণে আমাদের সবাই মিলে আজকে চিন্তা করা দরকার, কেন হয়নি? ৭১-এও অনেক মূল্য, অনেক রক্ত দিয়ে আমরা সে

সুযোগ অর্জন করেছিলাম। সংবিধানে লেখা হয়েছিল সকল মানুষের সমান অধিকার, মানুষে মানুষে কেউ শোষণ করবে না, সকল নাগরিক, সকল মানে সকল পাহাড়ী এবং বাহিরের লোক এগুলো আলাদাভাবে না দেখে তখন সকলেরই আত্মবিকাশের সমান সুযোগ থাকবে। এ কথাও তো আজকে বাস্তবায়িত হয়নি, কারোর জন্য হয়নি। শহর এবং গ্রামের মধ্যে বৈষম্য কমানোর প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার রয়েছে। বৈষম্য বেড়েছে, কমে নাই। আজকে পাহাড়ী ভাইদেরকে বিশেষ করে এ কথা বলতে চাই যে, যে মন মানসিকতা নিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আর আমরা বসেছি দীর্ঘদিন, মূল লক্ষ্য সম্পর্কে আমাদের কোন বিভেদ ছিল না, কোন রকমের মতবিরোধ ছিল না। কথা হলো যে, সেখানে আপনারা সশস্ত্র যুদ্ধ করে একটা অবস্থা সৃষ্টি করে শান্তি চুক্তি করেছেন, স্বাভাবিকভাবে মানুষ ধরে নিতে পারেন যে, হ্যাঁ, এই চুক্তি অনেক মূল্য দিয়ে অর্জন করা হয়েছে। এটাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করা হবে যাতে আমাদের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে এবং এই আশাটা অবশ্যই সবাই আমরা করতে পারি এবং এটা শুধু আদিবাসী অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাই বোনদের আকাঙ্খা নয়। এই শান্তি চুক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করা আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন।

সংবিধানও বাস্তবায়িত হবে না, সংবিধানের কথাও থেকে যাবে যথারীতি, কাজে পরিণত হবে না, যদি শান্তি চুক্তিকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করতে না পারি। এটা করার জন্য আজকে কি করনীয় দাবী তা আমরা করে যাবো। মঞ্চ থেকে দাবী করা যায় কিন্তু মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে আমাদের করণীয়টা কি? এখানে আমার কথা হলো যে সুষ্ঠু রাজনীতি। এ সংবিধান এবং এই শান্তি চুক্তি উভয়ের জন্য যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে সুষ্ঠু রাজনীতি। এটার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা যায়। সংবিধান, আইন করে সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সুষ্ঠু রাজনীতির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করা যাবে। সংবিধানে যে কথাগুলো লেখা আছে এগুলো দিক নির্দেশনা, সমাজ পরিবর্তনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে ন্যায় নীতির ভিত্তিতে ন্যায় সঙ্গত দাবীগুলোকে বাস্তবায়িত করে মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করা। মানুষের যে মর্যাদা, যে অধিকার এটি সংবিধানে এবং শান্তি চুক্তিতে বিস্তারিত লেখা আছে।

পাহাড়ী ভাই বোনেরা চেয়েছেন যে এই চুক্তির ভিত্তিতে তাদের যে ন্যায় সঙ্গত দাবী, যে অধিকারের কথাগুলো আছে সেটা বাস্তবায়িত করলে তারা সেই দীর্ঘ দিনের শোষণ থেকে মুক্ত হবে, অন্যায় থেকে মুক্ত হবে। এর পথে বাধাগুলো কোথায় আছে এই বিষয়গুলো বাস্তবায়িত করলে যারা মনে করেন তাদের স্বার্থে আঘাত লাগতে পারে তারাই এই বাধা সৃষ্টি করছে। অন্যায়ভাবে যে স্বার্থ তারা এতদিন ভোগ করে আসছে, ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে একটা নতুন কিছু বাস্তবায়িত করতে হলে আগেকার সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে সেখানে কারো না কারো আঘাত লাগে। যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারাই কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে নানাভাবে কলা কৌশল করে সেই বাধাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, নানা রকমের যুক্তি, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সেই শান্তি চুক্তি হওয়ার পরে পরে অনেকেই সংবিধানের কথা তুলে বলেছে যে এটা কি সংবিধান পরিপন্থী হয়নি? আমি সেটা মনে করি না। আমি আজকে যেটা বলছি, আমি মনে করি যে উভয়েই কিন্তু মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। এই সংবিধানও জাতি গ্রহণ করেছে এবং এই শান্তি চুক্তিও গ্রহণ করেছে অর্থাৎ উভয়েই একে অন্যের পরিপূরক। এটাকে বাস্তবায়িত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য এবং আমি মনে করি অধিকাংশ মানুষ এইভাবে বিষয়টা নেবে, শুধু তারাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে যাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে।

আমরা অনেক কিছু দেখেছি, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জীবনে আপনাদের জীবনে সে সময়ে আমরা অগ্রসর হতে পেরেছি, সামনে যেতে পেরেছি; যখন আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকেছি নীতি এবং লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। আজকে যদি আমরা মনে করি এ কথাগুলো বিতর্কের উর্ধ্বে যে- সংবিধান অক্ষরে অক্ষরে দেশে পালন করা হোক, বাস্তবায়িত হোক এটা

আমাদের সকলেরই আকাঙ্খা, এই ব্যাপারে যদি আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই যে এগুলোকে বাস্তবায়িত করাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য, তাহলে এইগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য এখানে কোন মত পার্থক্য আমাদের মনের মধ্যে থাকতে পারে না এবং এই পথে যারা বাধা দিচ্ছেন তারাই কিন্তু সংবিধান পরিপন্থী কাজ করছেন। আমাদের আজকের দাবী, আমাদের সংবিধানের কথাগুলো কথায় যাতে না থাকে, কাজে পরিণত হোক। শান্তি চুক্তির কথাগুলো শুধু কথায় না থেকে কাজে পরিণত হোক। এই কথা থেকে কাজ এবং যেটা আমাদের ৩০ বৎসরের মূল সংকট- কথা আর কাজের মিলটা না থাকা।

আমরা সবাই মঞ্চ থেকে ভালো কথা বলে থাকি, কিন্তু মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে যখন কাজের সময় আসে তখন দেখা যায় যে নিজস্ব স্বার্থকে আমরা বড় করে দেখি। বৃহত্তর স্বার্থে, সকলের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে আমরা বিসর্জন দিয়েছি। তাই আজকে যদি জাতীয় স্বার্থে, সকল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সেই বাধাগুলো অতিক্রম করে আমাদের যে সেই ৭২ এর স্বপ্ন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্বপ্ন, আমার স্বপ্ন এবং আমাদের সকল ভাইবোনদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাই তাহলে এই ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরকে এই শিক্ষা অর্জন করতে হবে যে, যারা পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করে, যারা শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদেরকে চিহ্নিত করে এবং যারা শোষিত, যারা অন্যায়ের শিকার হয়ে এসেছে, তাদের সকলকে একত্র হয়ে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমি মনে করি যে আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি এই ৩০ বৎসর। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের যে মর্যাদা, তার যে নিজের আইডেনটিটি, সকলকে নিয়ে সেভাবে মর্যাদার সহিত সমান অধিকার যেন আমরা সকলেই ভোগ করতে পারি সে লক্ষ্যই হল মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি মনে করি আমাদের সকল পাহাড়ী ভাই বোনেরা এবং সারা বাংলাদেশের যে মানুষ তাদের অধিকার একত্র করে, সমন্বিত করে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে আমি বিশ্বাস রাখি, আশা রাখি যে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো।

আপনাদের কাছে আমার আন্তরিকভাবে এই আবেদন থাকলো, আসুন আমরা সবাই মিলে সেই যে মূল লক্ষ্য- সকল মানুষের যে অধিকার, মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার- যেটা সংবিধানে রয়েছে, শান্তি চুক্তির মধ্যে রয়েছে দুইটাকে পরিপূরক হিসেবে ধরে আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে অর্জন করার জন্য এগিয়ে যাই। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের বিজয় অবশ্যই আমরা ছিনিয়ে আনবো - এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

## চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য সরকারের একটা মহল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে চলেছে

**শক্তিপদ ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং আলোচনা সভার সভাপতি**

আজকের আলোচনা সভায় সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং একটি জাতীয় সমস্যা। সে কারণেই ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি হয়েছিল এ সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য। চুক্তি যদিও হয়েছিল রাজনৈতিক সমস্যাকে স্বীকার করে কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই পূর্বতন সরকার শেখ হাসিনা সে চুক্তি যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করেনি। বরং আমরা দেখতে পেয়েছি যদিওবা এ সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাই শেখ হাসিনা সরকার অপারেশন উত্তরণ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে আবার সামরিক শাসন কায়েম করে সে সমস্যার মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। বর্তমান সরকারও সেই পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে মোকাবিলা করতে চান, সেই পথে সমাধান করতে চান। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য যে চুক্তি হয়েছে সে চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে পারছে না। এ অবস্থার মধ্যে ৫ বছর পূর্তি হলো। তাই আমরা বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী, মানবতাবাদী মানুষের কাছে আমাদের আহবান জানানোর জন্য ঢাকাতে আমাদের এবারের এই চুক্তি দিবস পালন করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করার জন্য চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ চলছে। আপনারা জানেন যে, সব সময় সরকারের একটা বিশেষ মহল এই চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একটা অংশ সেই প্রসিত-সঞ্চয়ের চক্র চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কাজের একটা অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা বিভিন্নভাবেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যেই আগষ্ট মাসের একটি পত্রিকায় দেখতে পাবেন যে তারা রামগড় থানার তৈচাকমা গ্রামে অনেক ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, অনেক জনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। তেমনিভাবে খাগড়াছড়ি সদর থানাতেও তারা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামের লোকদের অপহরণ করেছে, ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেজন্য সরকারের একটা মহল সব সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করে চলেছেন।

এখানে বিভিন্ন বক্তা বাংলাদেশের সমতল এলাকার আদিবাসীদের কথা তুলে ধরেছেন। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী সভাপতি সেই সমস্যাকে চিহ্নিত করে, সে সমস্যার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম নামে একটা রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেছেন। সেই

সংগঠনের মধ্য দিয়েই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেমনি অধিকারহারা জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি তেমনিভাবে বাংলাদেশে যে সব আদিবাসী ভাই রয়েছেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সম্মিলিতভাবে এই সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

সর্বশেষে আমি আবার বলবো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা অনিবার্য। সেজন্যই আজকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইয়েরা, সুধীবৃন্দ এবং যারা উপস্থিত হননি দেশের যারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মানবতাবাদী সবাইকে আমি আহবান জানাচ্ছি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির জন্য, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আপনারা এগিয়ে আসবেন। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা দীর্ঘ ৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সরকার এ চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি যথাযথভাবে। সেজন্যই আমরা এই চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য আগামীতে আন্দোলন সংগ্রাম, আরো সুকঠিন আন্দোলন সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

এই সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে এবং আজকে যারা অনেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং সভা সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে। এই অংশে চুক্তিটি পত্রস্থ করা হলো।

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

## ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রনয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন ;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষন করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে ;

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য | ঃ | আহ্বায়ক |
| (খ) | এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান | ঃ | সদস্য |
| (গ) | পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি | ঃ | সদস্য |

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

পাতা-১

## খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেনঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১,২,৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে-"কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

পাতা-২

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত 'তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষনা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়ছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবেঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত,

পাতা-৩

বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্যকোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

পাতা-৪

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

পাতা-৫

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন"— এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কতৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

পাতা-৬

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতিত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;

খ) পন্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষন বা নিস্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

## গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

| | |
|---|---|
| চেয়ারম্যান | ১ জন |
| সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ) | ১২ জন |
| সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) | ২ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ) | ৬ জন |
| সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) | ১ জন |

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

পাতা-৮

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহি কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগনিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

পাতা-৯

ঘ) পরিষদ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিও'দের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতায় থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

পাতা-১০

## ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরিন উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট করণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;
খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);
গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;
ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;
ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের

পাতা-১২

পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিত কালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারনে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া শুনার সুযোগসুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতিত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরনে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

পাতা-১৪

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি

৮) সাংসদ, বান্দরবান

৯) চাকমা রাজা

১০) বোমাং রাজা

১১) মং রাজা।

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০০৩
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

**শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা**

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its
Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh.
Phone : + 880-0351-61248
E-mail : pcjss@hotmail.com

**Price : Tk. 35.00 Only**